প্রতিদিন ২০ জানুয়ারি ২০০৮

রোববার

জলসাঘর

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন শুভজিত কুণ্ড

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com

গোলপার্ক ঃ ২৪৪০ ১৭৯২ / ২৪৬০ ০৫৮১ সল্টলেক ঃ বি. ই. ১০১, ২৩২১ ২০৫৭ / ২৭৮৬
সল্টলেক ঃ এইচ. এ. - ৩, ২৩২১ ৮৩১০ / ১১ বেহালা ঃ ২৪৪৫ ৫৭৮৪ / ৮৫.
শোভাবাজার ঃ ২৫৩৩ ৫৮৩২ / ৫৮৩৪

www.anjali.bz

এছাড়া আমাদের আর কোন শো - রুম নেই

theadventurekol gmail.com

লেটারবক্স
পাঠকের পাতা ৪

ফার্স্ট পার্সন
ঋতুপর্ণ ঘোষ ৬

ভালো-বাসার বারান্দা
নবনীতা দেবসেন ৮

এবার মলাট
জলসাঘর
গানবাজনার দু-চার কাহন
অশেষ চট্টোপাধ্যায় ১০
নাম রেখেছি কোমলগান্ধার
তেজেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার ২০
গোঁসাইবাগান
জয় গোস্বামী ২৪

বাংলার মুখ
পথের পাঁচালি
জয়া মিত্র ২৮

রোববারের রামপ্রসাদী
আয় মন বেড়াতে যাবি
সুব্রত মুখোপাধ্যায় ৩০

রোববারের মেগা
কলিকাতায় নবকুমার
সমরেশ মজুমদার ৩৪

সেন সলিউশনস
রাইমা সেন ৩৮

রান্নাঘরে রেস্তোরাঁ
ড্যাশ অফ দিস, ড্যাশ অফ দ্যাট-এর রেড কারি পেস্ট ৪০

সৌজন্য
শিশিরকুমার মণ্ডল
নিতাই মণ্ডল
স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়

টিম রোববার

অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়
গীতিষা দাশগুপ্ত
তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
নীলাঞ্জনা বসু
প্রসূন চক্রবর্তী
বর্ণিনী মৈত্র চক্রবর্তী
বিপুল গুহ
রিংকা চক্রবর্তী
রাজু সরদার
শান্তনু দে
সুপ্রিয় দাস

প্রচ্ছদ
তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক ঋতুপর্ণ ঘোষ

প্রতিদিন প্রকাশনী লিমিটেডের পক্ষে সুঞ্জয় বোস কর্তৃক
বি এল পাব্লিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত।

সংবাদ প্রতিদিন এর সঙ্গে বিনামূল্যে

সিক্তের যাত্রায় জাগো

রোববার এখন আর আমার কাছে শুধুমাত্র পত্রিকা নয়। রোববার মানে 'নেশা'। শনিবার রাত থেকেই কাউন্টডাউন শুরু হয়—কখন হবে ভোর—রোববার হাতে আসবে মোর। রোববার-এর 'সিক্তবসনা' এমন এক ভোরে এল, যে ভোরে নিম্নচাপে আক্রান্ত আকাশ অঝোর ধারায় কেঁদেই চলেছে। প্রকৃতি যেন আজ সত্যিই সিক্তবসনা। বসন ভিজবে নারী শরীরের, জটিল অঙ্ক উন্মোচিত হবে, আর সেই উন্মোচনে রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থাকবে না, তাই কখনও হয়? 'যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল' লিখতে গিয়ে রঞ্জনবাবু অনেকেরই ভেজার কথা বলেছেন। কিন্তু অন্তররসে রাধার ভিজে ওঠার কাহিনি তিনি যেভাবে জয়দেব, বিদ্যাপতি চন্ডীদাসের পথ ধরে বর্ণনা করেছেন, তাতে আমরাও ভিতরে ভিতরে দগ্ধ হয়ে ভিজতে চেয়েছি। ভিজতেও যে এত সুখ, রঞ্জনবাবুর কলমে ভেজা রাধার গল্প না পড়লে জানতেই পারতাম না।

বিজন মজুমদার
ইছাপুর

যৌনতার লুকোচুরি খেলা

২৩ সেপ্টেম্বর রোববার-এর 'সিক্তবসনা' সংখ্যা মনের আকাশে যৌনতার যে উদ্দাম উষ্ণতা ছড়ালো তাতে প্রথম সকালের সূর্যের উত্তাপ ম্লান হয়ে গেল! প্রচ্ছদের পটচিত্রে সদ্য স্নাত রমণীর সিক্ত শরীরের পশ্চাদদেশ দর্শনে দৃষ্টিতে অগ্ন্যুৎপাতের সৃষ্টি হল। রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল' রচনায় সিক্ত রাধার যে রূপ বর্ণিত হয়েছে তা অবশ্যই রসিক পাঠকের রসনাকে রোমাঞ্চিত করেছে। আজকের অবাধ যৌনতার যুগে অতীতের রসময়ী রাধিকা যেন পুরুষের কামপ্রবৃত্তির পাতে সর্বশ্রেষ্ঠ লোভনীয় পদ। যশস্বী শিল্পী শুভাপ্রসন্নর দার্শনিক দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে বেশ কিছু চিরকালীন সত্য। আমাদের মতো রক্ষণশীল দেশে তথাকথিত সনাতন ভাবাদর্শের লালিত যৌনতা যেন রহস্যমাখা এক লুকোচুরি খেলা। আজ সেই ঐতিহ্যের অসহ্য বেড়াজাল ডিঙিয়ে বিশ্বায়নের বাড়িয়ে দেওয়া মুক্ত হাত ধরে বেপরোয়া বিপ্লবের পথে এগিয়ে চলেছে ভারতীয় যৌনতা।

দেবাশিস হাজরা
হাওড়া

চিকন রিরংসা

২৩ সেপ্টেম্বর 'সিক্তবসনা' সংখ্যায় 'যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল' পড়ে শরীর-

মন-প্রাণ-আত্মা সবই ভিজে সপসপে হয়ে গেল। শ্রদ্ধেয় রঞ্জনদার ব-কলমে রসালো মুদ্রার নিবিড় ভাষায় আবেশ, আবেগ আর উচ্ছ্বাসের বর্ণচ্ছটায় এল রঙিন অনুভূতি। মুহূর্তটার চিকন অনুরণনে, ঠিক কীভাবে কোনদিক দিয়ে, কেমনভাবে ভিজব, ঠাওর করতে না পেরে একই বৃষ্টিতে বারবার ভিজে-নেয়ে, আশা-ক্ষিদে কোনওটাই কমাতে পারলাম না। উল্টে হৃদয়ের পংক্তিতে রিরংসার-বীজ, ঘ্রাণ উঠে এল। আশা করি প্রতি রবিবার এমনই লেখার বিচ্ছুরণে রোববার জবরদস্ত হয়ে থাকবে।

অরুণাশিস মুখোপাধ্যায়
কলকাতা-১২

নয়নমণি

২৩ সেপ্টেম্বর 'সিক্তবসনা' সংখ্যাটি পড়ে সত্যিই ভাল লাগল। তবে এই সংখ্যায় 'এবার মলাট'-এর 'যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল' লিখতে গিয়ে লেখক রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বৈষ্ণব পদাবলির রাধা আর শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের বর্ণনা দিতে গিয়ে বড্ড বেশি রগরগে যৌন আবেদনের ভাষা প্রয়োগ করেছেন। এগুলো কি না লিখলেই নয়, রঞ্জনবাবু? বাড়িতে ছোট-বড় সবাই রোববার পড়ে। এই সংখ্যাটি সবার সামনে পড়তে গিয়ে লজ্জায় পড়তে হয়েছে। তবু বলব, রোববার সত্যিই সবার থেকে আলাদা, সব থেকে পছন্দসই পত্রিকা। মহামূল্য এই পত্রিকা সকলের 'নয়নমণি'।

দেবনারায়ণ চক্রবর্তী
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

দুঃসাহসের জন্ম

বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়া জিনাতকে নিয়ে 'জিনাতেতে লাগে টঙ্কার' কিছু পুরনো স্মৃতি উস্কে দিল। যে তাতে শরীর পুড়েছিল, যে জিনাতের জন্য বইখাতা লাটে উঠেছিল, যে জিনাতের জন্য ধাপে ধাপে দুঃসাহসের জন্ম হয়েছিল—এই প্রতিবেদন তথা গভীর ভুবন সেই গুপ্ত জিনাতের মুখোমুখি দাঁড় করালো, সেদিনের আনমনা, উন্মনা হার-না-মনা তৃষ্ণার্তকে। সেদিনের সেই সিক্তবসনাকে দেখে রিক্ত, নিঃস্ব, পূর্ণ হতে এই গতিময় যুগ, এই ই-মেল সংস্কৃতিও আকুল হয়ে থাকবে। রোববার পড়ে এই চিরকালীন মূর্তিরই স্পর্শ পেলাম। রোববার সেই বিরল অনুভবের চেতনায় সবুজ করল বেড়ে যাওয়া বয়সকে, বুড়ো হয়ে যাওয়া মুহূর্তকে, ফুরিয়ে যাওয়া ইচ্ছেগুলোকে। চরম নিঃসঙ্গতার মাঝে এ এক পরম প্রাপ্তি।

হীরালাল শীল
কলকাতা-১২

অব্যক্ত সৌন্দর্য

রোববার-এর 'সিক্তবসনা' শীর্ষক সংখ্যাটি পড়ে বেশ ভাল লাগল। বিশেষত অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়ের লেখাটি। মনে পড়ে গেল, সেই তখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ভূ-তত্ত্ববিদ্যা' নিয়ে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। কলেজ থেকে গিয়েছি ঘাটশিলাতে সার্ভে করতে। সুবর্ণরেখা নদীর ধারে বসে আছি ক্লান্ত দুপুরে। হঠাৎ আমার চোখে ধরা পড়ে আমার দেখা প্রথম সিক্তবসনা সুবর্ণরেখা নদীতে স্নানরতা অবস্থায়।

আজও বৃষ্টি পড়ে এই মহানগরীতে। আমার চোখ গাড়ির পিছনের সিট থেকে সাবধানে জানলার কালো কাচ থেকে উঁকি দেয় সেই অব্যক্ত সৌন্দর্য দেখার জন্য। জানি না হয়তো অনেকেই আমার এই স্বীকারোক্তিকে ধিক্কার জানাবে। তবে পাশ্চাত্য পোশাকের আধিক্যে সিক্তবসনাদের উপভোগ করা যায় না। ধন্যবাদ রোববারকে অত সুন্দর একটি লেখা উপহার দেওয়ার জন্য।

সৈকত মৈত্র
কলকাতা-৭৫

নগ্নতার ছোঁয়া

রোববার-এর 'সিক্তবসনা' সংখ্যা পড়ে রসালো পাঠককুল এখন সিক্ত। একেবারে বেআব্রু শব্দ নেই অথচ নারী অঙ্গের সব গোপনতা যেন খসে গেল। একটু একটু করে সৌন্দর্য পাপড়ি মেলে বিকশিত হল একেবারে নগ্নতা প্রদর্শন না করে, রেখেঢেকে নগ্নতার ঈষৎ ছোঁয়াই বেশি আকর্ষণীয়। সবকটি লেখাই মাদকতায় পরিপূর্ণ! কে বলে অক্ষরের প্রতি মানুষের টান কমে গিয়েছে? বর্ণমালার সিক্ত বিনুনি যেমন পাঠককে নেশাগ্রস্ত করে। তেমনই 'সিক্তবসনা' একটি সুবিন্যস্ত পরিকল্পিত নিবেদন। 'ফার্স্ট পার্সন'-এ ঋতুদার লেখা সামাজিক দর্পণ না একটি অনুগল্প! বারবার পড়েছি। এ যেন চলমান প্রতিদিনের ঘটনার চিত্রনাট্যের একটি অংশ পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। আর একটি কথা, অশ্লীল

চোখে যেন কেউ প্রচ্ছদকে না দেখেন। এ প্রচ্ছদেও কিন্তু বাস্তবতার ছোঁয়া আছে যা, এই সংখ্যারই আকর্ষণীয় অঙ্গ।

বিবেকানন্দ নস্কর
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

কলম দিয়ে ছবি

'সিক্তবসনা' সংখ্যার 'ফার্স্ট পার্সন' পড়লাম। লেখা তো নয়, যেন কলম দিয়ে ছবি এঁকেছেন। বোধহয় ছবি বানান বলেই এত সহজে পারেন। তবে জোরো ছেলের মা 'পার্বতী'কে আবার বৃষ্টিতে ভেজালেন কেন? আর আপনার 'ভাদুড়ীমশাই'কে সাবধান করে দেবেন, খড়খড়ি দিয়ে উঁকি মারার অভ্যাসটা ভাল নয়। যদি কাজের মেয়েগুলো বুঝতে পারে তাদের চান করা দেখছে, তাহলে চোখ গেলে দেবে। বরং ওকে আপনার 'সিক্তবসনা' পড়ার এবং দেখার পরামর্শ দিন। অপূর্ব হয়েছে এই সংখ্যাটি।

গোবিন্দ মতিলাল
কলকাতা-৮

চিঠি পাঠাবার ঠিকানা
লেটার বক্স, রোববার
সংবাদ প্রতিদিন
২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০০৭২
ই-মেল :
robbar.pratidin@gmail.com
ফ্যাক্স : 22127977

ফা
ফার্স্ট পার্সন

এর মধ্যে বাবা হাসপাতালে ভর্তি হল, হঠাৎ-ই। কয়েকদিন ধরে বিমর্ষ হয়ে ছিল কেমন, কথাও বলছিল না বেশি কারও সঙ্গে। সেদিন সকাল থেকে দু'বার বমি করল। তারপর থেকেই চোখের দৃষ্টি কেমন ঘোলাটে, একটা অস্থির অন্যমনস্কতা, আর সম্পূর্ণ মৌনতা।

'বাবা' বলে ডাকলে যেন কোনও সুদূর দেশ থেকে সাড়া দিচ্ছে কেবল দৃষ্টি দিয়ে। মুখে কিছু বলছে না।

চিন্তা হ'ল। তপনদা, ডঃ টি কে ব্যানার্জী। মা'র অসুস্থতার সময় থেকে আমাদের পরিবারের সঙ্গে যুক্ত, আমাদের মেডিক্যাল অভিভাবক প্রায়। তপনদা সঙ্গে সঙ্গেই পরামর্শ দিলেন—বাড়িতে রেখো না, হাসপাতালে ভর্তি করে দাও।

শ্রীঅরবিন্দ সেবা কেন্দ্র (ই ই ডি এফ) আমাদের বাড়ি থেকে পাঁচ মিনিটের পথ। মা'র অসুস্থতার একটা বড় সময় আমাদের বাড়ির সকলেরই ওখানে কেটেছে—নিয়মিত যাতায়াত করতে করতে আমরা ওই হাসপাতালের প্রায় সব সদস্যকে হয় মুখে, নয় নামে চিনি।

আর বাবার প্রতি ওখানকার ডাক্তার নার্সদের একটা আলাদা মনোযোগও আছে।

তক্ষুনি ফোনে যোগাযোগ করে ভর্তি করে দেওয়া হল।

বাড়ি থেকে হাসপাতাল নিয়ে যাওয়ার সময় দোতলা থেকে একতলায় নামতে বাবার যেন কয়েক যুগ লাগল।

ভর্তির ফর্ম, কাগজপত্র, মেডিকাল রিপোর্ট গুছিয়ে ইনটেনসিভ কেয়ারে বাবাকে ভর্তি করিয়ে যখন ফিরে আসছি, তখন ওঁরা ই সি জি চালু করছেন।

বাবার পাঞ্জাবি ছাড়িয়ে হাসপাতালের পোশাক পরানো হচ্ছে।

ঘাড় ঘুরিয়ে একবার বাবার বেড-এর দিকে তাকালাম। শীর্ণ, ছোট্ট হয়ে যাওয়া একটা পিঠ, বাধ্য ছেলের মতো দু'হাত তুলে বাবা জামা পরছে—যেন স্কুলে যাবে।

২

রাত্তিরেই সি টি স্ক্যান হ'ল। কতগুলো ইনফ্রাক্ট (infract) ধরা পড়েছে—স্বাভাবিকভাবে মস্তিষ্কে যে রক্তচলাচল হওয়া উচিত, সেটা ব্যাহত। ফলে বাবার চেতনা এবং স্মৃতির ওপর তার প্রকোপ বেশ তীব্র।

পরেরদিন সকালে এমার্জেন্সি পাস নিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

দেখি বাবা দিব্যি চোখ মেলে চেয়ে। আমায় দেখে চিনতেও পারল।

প্রথমেই প্রশ্ন,

—তুমি কোথা থেকে এলে?

—বাড়ি থেকে।

—তুমি জানলে কী করে আমি এখানে আছি?

যতটা অবাক হওয়ার কথা, ততটা হলাম না। হাসপাতালে এলেই এই স্থান-কাল-পাত্র বিভ্রান্তি মা'রও আগে হতে দেখেছি। বাবারও হয়েছে। সাধারণত সবাই তখন হাঁ হাঁ করে বোঝাবার চেষ্টা করে যে, তুমি যা ভাবছ তা ভুল, আমার পদ্ধতিটা একটু অন্যরকম। আমি চেষ্টা করি তাদের সেই তাৎক্ষণিক কাল্পনিক জগতটার মধ্যে একটু ঢুকতে। আমি পাল্টা জিগ্যেস করলাম

—তুমি এলে কী করে এখানে?

বাবা কিছুক্ষণ চুপ হয়ে গেল। তারপর ধীরে ধীরে বলল,

—তুমি জানো না?

আমি একটু অজ্ঞানতার ভান করলাম।

—ঠিক মনে পড়ছে না। বলো।

বাবা প্রায় ফিসফিস করে বলল,

—আমাকে তো এখানে ধরে এনেছে।

আমি কথা বাড়ালাম না। বললাম—ও।

এবার বাবার প্রশ্ন,

—তুমি জানতে পারলে কী করে? তোমায় খবর দিল কে?

আমি অল্পক্ষণ ভাবলাম, তারপর বললাম

—আমার অফিস থেকে খবর দিল। খবরের কাগজের অফিস তো! ওরা সব খবর পায়।

বাবাকে বেশ নিশ্চিন্ত দেখাল। ধীরে ধীরে বলল,

—আমাকে কিন্তু খুব যত্নআত্তি করছে। কাল রাত্রে একটি ছেলে, এই তোমাদের বয়সীই হবে, বলল—মেসোমশাই আপনি এবার ঘুমোন।

আমি বললাম,

—হ্যাঁ, ওরা তোমায় চেনে তো।

মা যখন ভর্তি ছিল, তুমি তো রোজ আসতে। তোমায় চেনে তাই!

বাবার এবারের কথাটার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না।

—ধ্যাৎ! তোমার মা তো অরবিন্দ সেবা কেন্দ্র-য় ছিল।

আমি বললাম,

—হ্যাঁ! এটাই তো সেটা।

ওরা নতুন আই সি ইউ করেছে। তুমি তাই চিনতে পারছ না।

এরপর বাবা যেটা বলল, তার সঙ্গে পাল্লা বোধহয় কোনও কল্পনাশক্তি দিয়েই দেওয়া যায় না।

—কী যা তা বলছ? এটা আই সি ইউ হবে কেন?

—তবে কী এটা?

—এটা একটা রিসার্চ সেন্টার। এখানে যারা রয়েছে তারা কারা, জানো?

—কারা?

—এদের সব ধরে এনেছে—এরা নাকি আসলে হিউম্যান বম্ব।

—কী!

—হ্যাঁ। সোনিয়া গান্ধীর মনে ভয় ঢুকে গিয়েছে। স্বামী গিয়েছে—ছেলেটা তো আছে, ও নিজে আছে। তাই যাকেই সন্দেহ হচ্ছে ধরে এনে পরীক্ষা করে দেখছে, তারা সত্যি সত্যি মানববোমা কিনা. অমনি তাদের ডি-অ্যাকটিভেট করে দিচ্ছে।

আমার আর কোনও কথা মুখে জোগাল না। শুধু বললাম,

—তুমি ভেবো না। একটু ভাল হয়ে যাও। তোমায় বাড়ি নিয়ে যাব। কেউ কিছু করবে না তোমায়

একনাগাড়ে অনেকক্ষণ কথা বলার জন্যই হোক, আর শারীরিক দুর্বলতার কারণেই হোক, বাবা আর কথা বলল না। চোখ দুটো বন্ধ করল কিছুক্ষণ।

আমার বাবা বড় হয়েছে বাংলাদেশের গ্রামে। আমাদের মতো সুরক্ষিত জীবন ছিল না বাবার। স্বাধীনতা সংগ্রামের গোপন চিঠি পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে বালকবাহিনী ছিল—বাবা ছিল তাদের মধ্যে একজন। অমাবস্যার রাতে নদী সাঁতরে গোপন খবর পৌঁছে দেওয়ার অনেক অভিজ্ঞতার গল্প বাবার কাছে শুনেছি। তারপরে রাতারাতি ছিন্নমূল হয়ে এই বাংলায় চলে আসবার পরও বাবাকে ক্ষুব্ধ হতে দেখেছি, কিন্তু ভয় পেতে দেখিনি কখনও।

বাবার জীবনের একটাই ভয় ছিল—আমার মা'র অসুস্থতা। তাছাড়া, সর্ব অর্থেই সত্যিই বাবার মতো নির্ভীক মানুষ আমি বড় একটা দেখিনি।

হয়তো এটা সাময়িক কোনও ডিমেনশিয়া। ডাক্তাররা অন্তত তাই বলছেন।

বয়সের পলিতে ক্লান্ত মস্তিষ্ক যেন সদাজাগ্রত হয়ে থাকত কেবল মা'র ওষুধ কখন কোনটা বাদ পড়ে যাবে—এই ভয়ে।

মা চলে যাওয়ার পর থেকে সত্যিই বাবা আর সচেতন সক্রিয়ভাবে মস্তিষ্ক সঞ্চালন করেছে বলে মনে হয় না। সেই আলস্যের পথ ধরে ঢুকেই পড়তে পারত হৃদয়ের সমস্ত জং, ছড়িয়ে পড়তে পারত মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষে।

কিংবা হয়তো বা এতদিনের নির্ভীক মস্তিষ্কটুকু ভারি হয়ে উঠত কোনও নিরালম্ব শূন্যতায়।

কিন্তু এই বিভীষিকা কোথা থেকে ঢুকে পড়ল আমার বাবার মাথার ভেতর!

চিরকাল মনে হয়ে এসেছে বাবাদের সময়টা যেন এক পুরাণকাল। সেখানে আমবাগানের ছায়া, সেখানে রূপোলি ইলিশ মাছের ঝাঁক, সেখানে বটের আঠার মতো ঘন দুধ, সেখানে ঈদের দিনে সেজেগুজে নৌকো করে বন্ধুর বাড়ির দাওয়াত-এ যাওয়া।

সেই জগতে লোভ নেই, ভয় নেই, ক্লান্তি নেই। ভালবাসার কোনও সীমানা নেই।

কেমন করে সেই জগতটাতে ঢুকে পড়ল পরমাণু চুক্তি-বেনজির ভুট্টো—রাষ্ট্রীয় অত্যাচারের অমন বিভীষিকাময় সদাজাগ্রত ত্রাস!

কথা তো দিয়ে এলাম, কিন্তু কোন বাড়িতে নিয়ে আসব বাবাকে? কারণ আমার বাবা বাড়ি হারিয়েছে ওপার বাংলায়, কিন্তু এখনও তো বাড়ি বলতে মানুষটা একটা নিরাপদ আশ্রয়ই বোঝে।

মহাভারতে পড়েছিলাম, বেদব্যাস শোকবিহ্বলা সত্যবতীর কাছে এসে বলেছিলেন,

—মাতা, সুখের দিন শেষ হয়েছে। পৃথিবী এখন বিগতযৌবনা। ক্রমশ পাপের বৃদ্ধি হবে। চলুন, আমরা এই প্রাসাদ ছেড়ে বাণপ্রস্থে যাই।

বাণপ্রস্থে বসে বাকি জীবনটুকু কেমন করে কাটিয়েছিলেন সত্যবতী, মহাভারতকার আমাদের সে কথা জানান না। আমরা জানি না, কোন অরণ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনি।

কিন্তু আমরা একথা জানি, হস্তিনার অদূরে, যমুনার তীরবর্তী বহুপ্রাণীসমাকুল এক মনোহর খাণ্ডব অরণ্য ছিল। যে অরণ্য, অগ্নির মান্দ্য উপশমার্থে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন কৃষ্ণার্জুন। নিহত হয়েছিল অসংখ্য প্রাণ।

কে জানে হয়তো সেই মহামারণযজ্ঞে সন্তানধাত্রী তক্ষকপত্নীর মতোই ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিলেন অসহায়া বৃদ্ধা কুরু প্রপিতামহী! তারপর একদিন সেই ভস্মরাশির ওপরে নির্মিত হয়েছিল পাণ্ডবদের মহামহিম ইন্দ্রপ্রস্থ।

সুখের সময় সত্যি শেষ হয়েছে, বাবা।

এখন নিউক ডিল হবে। নন্দীগ্রাম হবে।

মানববোমা হবে।

স্তোকের দিনও শেষ হয়েছে, বাবা। বাড়ি হয়তো ফিরিয়ে আনব তোমায় ঠিকই। কিন্তু টেলিভিশনের পর্দার নিত্যকার রুধিরাক্ত অর্ধদগ্ধ মৃতদেহের তাড়া করা দুঃস্বপ্ন থেকে তোমাকে কতটা বাঁচিয়ে রাখতে পারব, জানি না।

ঋতুপর্ণ ঘোষ

নবনীতা দেবসেন

জন্মদিনের কবিতা ২০০৮

ইচ্ছে করলেও আর ঝগড়া করা সম্ভব হবে না
ওরা
বেড়া গলে' নাগালের চলে গেছে

এখানে এখন আমরা খেজুরতলায়
তাঁবু পেতে আছি
পশ্চিম দিগন্ত থেকে উটের সারিরা
বালিয়াড়ি পার হয়ে আসে

(তারাপদ, প্রণবেন্দু, অমিতাভ, আর পার্থর জন্য,
নবনীতা)

অসহনীয় এই মৃত্যুর মিছিল। খবরের কাগজের নিত্য আলোচিত ট্র্যাজিক মৃত্যুগুলি আপাতত মন থেকে সরিয়ে রেখে, শুধু ঘরের লোকদের দিকে তাকাই যদি, মনে হয় হাওয়া নেই, নিশ্বাস বন্ধ, ডুবে যাচ্ছি। একই সঙ্গে চলে যাচ্ছেন বন্ধুরা এবং পিতৃবন্ধুরা, প্রতিদিন একজনের বিদায়সংবাদ আসছে। দশদিক চোদ্দ ভুবন যেন হাট করে খুলে গিয়েছে, আগল নেই, আয়ুর আড়াল বলে কিছু নেই আর। হা হা বাতাস বইছে, মানুষ বড় নিরাপত্তাহীন।

এই তো এই সোমবার আমাদের সুন্দরী, আদরিনী অর্চনা বউদি হঠাৎই চলে গিয়েছেন। অনেক আহ্লাদ পেয়েছি বউদির কাছে, আমরা দুজনেই গোখেল ইস্কুলের মেয়ে। মধ্যরাত্রে বউদির শরীর যখন নিয়ে আসা হল শ্মশানঘাটে, কিউ-তে তার ঠিক আগে, ১৮ নম্বরে ছিল রীতার বাবার শরীর। দু'জনের কি দেখা হয়েছিল, অদৃশ্যে, দেহ যখন প্রতীক্ষায়? তার আগে, ত্রিশে নভেম্বরে চলে গিয়েছেন কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত, বড়দিন নাগাদ মৃত্যু হয়েছে সুদেব রায়চৌধুরীর, তিরিশে ডিসেম্বর ছুটি নিলেন কাকাবাবু, পিতৃবন্ধু রেবতীভূষণ ঘোষ, একত্রিশে ডিসেম্বরে আমাদের ছেড়ে গেলেন বন্ধু প্রণবেন্দু, নববর্ষে হারিয়েছি গভীর স্নেহের আকর, কাকাবাবু প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র আর শান্তার বাবা সাধন দত্ত কে, পরশুদিন আমাদের স্কুলের শিক্ষিকা নমিতা দত্তর মৃত্যু হল আর এল কোচিন থেকে ডাক্তার সঞ্জয় সেনের মৃত্যু সংবাদ, বাল্যবন্ধু পার্থ বসু মারা গিয়েছেন গতকাল। এঁদের প্রত্যেকেই গুণী মানুষ, কেউ কবি, কেউ পণ্ডিত, কেউ শিল্পী, কেউ শিল্পপতি, কেউ চিকিৎসক, কেউ সম্পাদক, কেউ সাংবাদিক, কেউ মা, কেউ বাবা। আর যে যার নিজের লোকের কাছে আমরা তো প্রত্যেকেই জরুরি মানুষ। কারুর বয়স হয়েছিল কারুর বয়স হয়নি। মৃত্যুর বয়স বলে তো আসলে কিছু নেই? মধ্যযুগের ইয়োরোপে যেমন ৭০ ছিল আশানুযায়ী আয়ুর শেষ প্রান্ত, (দান্তে ভিভাইন কমেডি লিখছেন 'জীবনের মধ্যপথে', অর্থাৎ তখন তাঁর ৩৫)। ৭০ এর পরে বাঁচার সম্ভাবনাটা ফাউ। আমাদের তো তা নয়, **আমাদের হিসেব আলাদা**, একশো শরৎকালের কমে কথা বলি না **আমরা**। তাই যে বিগত আপনজনদের নাম করলুম তাদের **সকলেরই** ৭০ এর ওদিকে পা পড়লেও তাঁরা কেউই বুড়ো হননি। মৃত্যু এখনই তাদের দাবি না-ও করতে পারত।

বয়স তো সকলকে সমানভাবে দখল করতে পারে না, পাঁজি দিয়ে মানুষ মাপার মতো নির্বুদ্ধিতা আর নেই। মানুষকে মাপতে হয় কাজ দিয়ে। যাঁরা গেলেন, তাঁদের মধ্যে এক প্রণবেন্দু ছাড়া সবাই সমাজের কাজেকর্মে সক্রিয় অংশ নিতেন নিয়মিত, তাঁদের অভাব আমাদের বুকের মধ্যে ছাড়াও, তাঁদের কাজের মধ্যে অনুভূত হবে।

সব মানুষ বুড়ো হয় না। বুড়ো হওয়ার কোনও ফিক্সড এজ আসলে নেই। অনেক বুড়ো মানুষ আছেন পাঁজির হিসেবে যাঁদের বুড়ো হওয়ার কোনও রাইট নেই আসলে। আমাদের ক্লাসে এরকম বুড়ো ছোকরা কম দেখিনি প্রেসিডেন্সিতে। যাদবপুরেও কি ছিল না? জন্মবুড়োরা বয়সের তোয়াক্কা না করেই বুড়িয়ে যায়। আর জন্মছোঁড়ারা কিছুতেই বুড়ো হয়ে উঠতে টাইম পায় না। আমি আমার জীবনে অনেকগুলি মানুষ দেখেছি যাদের বয়স বেড়েছে, কিন্তু বয়স হয়নি। আমার বাবা তাদের মধ্যে একজন. আর ন মাসিমা ছিলেন আরেকজন। প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র ছিলেন উজ্জ্বল হয়ে কলকাতার চোখের সামনে, বয়সকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে, রোজ রোজ সভাসমিতির আমন্ত্রণে সাড়া দিতেন, ধীমান, স্মৃতিমান ব্যক্তির উপযুক্ত বক্তৃতা দিতেন। উজ্জ্বল মানুষ ছিলেন রেবতীভূষণও। তিনিও মাঝে মধ্যে সভাসমিতিতে আবির্ভূত হতেন, কখনও বক্তা কখনও শ্রোতার

ভূমিকায়, সেই বালি থেকে এসে, সভার বিষয়টি যদি তাঁর প্রছন্দ হত, মানুষটি যদি তাঁর প্রিয় হত। প্রতিদিন ছবি আঁকতেন নিয়মিত। গানও গাইতেন খুশি হলে। স্বচ্ছন্দ, স্বাধীন, সাংস্কৃতিক জীবনে ব্যস্ত থেকে নব্বই-এর পাশটিতে এসেও কাকাবাবুরা বৃদ্ধ হতে ভুলেই গিয়েছিলেন। ওঁদের মৃত্যু তো মৃত্যুর নয় জীবনেরই খবর দিয়ে গিয়েছে আমাদের।

এবার আমি তাকাতে চাই জীবনের মিছিলের দিকে। আমাদের ঘিরে আছেন বহু বয়স্ক যুবক যুবতী। আশে পাশেই তো মনে পড়ছে আশি পেরিয়ে যাওয়া অনেকগুলি তরুণ মুখ। সেদিন কলকাতাতে বাজাতে এসে দেড় ঘণ্টা বাজিয়ে রবিশংকর বলেছেন, 'বয়েস তো হল ঢের, কিন্তু মনের বয়েস যে কুড়ি পার হতে চায় না, অনেক চেষ্টা করি শরীরের সঙ্গে মনের বয়েসটা মেলাতে, কিন্তু, হায়, মেলে না!' এ বেদনা নিয়ে রবিশংকর তো একলা নন, তাঁর সঙ্গে আছেন মেলা সঙ্গী সাথী। (আমরাও কি নেই?) আছেন মান্না দে, অমলা শংকর, মৃণাল সেন, মহাশ্বেতা দেবী, তপন ও হাসি রায়চৌধুরী, মণি নাগ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অশোক মিত্র, শিবনারায়ণ রায়, রমাপদ চৌধুরী, শৈলেন মান্না, অমিতা মালিক, অমিতাভ চৌধুরী, তারুণ্যের কি অভাব আছে আশির ঘরে? এক একটি নাম উচ্চারণ করছি আর বুকের মধ্যে ভীরু প্রার্থনা গুঞ্জন করে উঠছে, মঙ্গল হোক, মঙ্গল হোক তোমাদের, জগতের নজর যেন লাগে না, চশমে বদ্দুর! তোমরা এবং তোমাদের মতো আর সবাই নব্বইতেও যেন এমনি তরতাজা থাকো, জ্যোতি বসুর মতো। এঁদের প্রত্যেকের অফুরন্ত যৌবনের মূলে আছে একই মন্ত্র, জীবনের প্রতি অফুরন্ত ভালবাসা। ওঁদের দেখে শিখেছি জীবনকে ভালবাসলে জীবনও তোমাকে ভালবাসবে।

আমারও তো সেই ম্যাজিক বয়সে পৌঁছনো হল, আরও কয়েকটা ব্যাপার শিখেছি। শিখেছি যে, বয়স সম্পূর্ণভাবে আপেক্ষিক। আর তার ভাল খারাপ নেই। ২৬ ভাল বয়স, ৬২ খারাপ, এটা পরিস্থিতি অনুযায়ী সত্য অথবা মিথ্যা, কখনও ৬২ ভাল আর ২৬ খারাপ হতে পারে। অন্যদের দেখে বুঝেছি, বয়সকে ভয় পেতে নেই। ভয় পেলেই সে চেপে ধরে, আরও ভয় দেখায়, একেবারে পেড়ে ফেলে। আবার তার উল্টোটাও ভুল। বয়স বাস্তব, অভিজ্ঞতা বাস্তব, বয়সকে অস্বীকার করতে নেই। সেটা প্রাকৃতিক পরিবর্তনকে অস্বীকার করার সমান, শীতকে তুমি জোর করে গ্রীষ্ম বললেই তো হল না? অথচ এও একেবারে ঠিক, যে পাঁজির বয়সই সব সময়ে আমাদের আসল বয়স নয়। একটা তোমার আসল বয়স আরেকটা তোমার ক্যালেন্ডারের বয়স। দুটো সবসময়ে এক না-ও হতে পারে। মূল বুঝেছি বয়সের সঙ্গে লড়াই করে পারবে না, শেষ হাসিটি সে হেসেই আছে।

আমি যাঁদের অল্পবয়সী দীর্ঘায়ুর কথা বলছি তাঁরা প্রত্যেকেই আপন আপন বয়সের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে তরুণ রয়েছেন, লড়াই করে নয়।

আর যাঁদের আমরা হারিয়েছি, বয়স যাই হোক, তাঁদের আয়ু ফুরিয়েছিল।

ব্যস, এই? তাহলে এত কথার কী মানে হল?

এই মানে হল যে, আয়ু আমাদের হাতে নেই কিন্তু ভাল করে বাঁচা অনেকখানিই আমাদের হাতে। যদিও জানি, ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যু আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে, তবু, যতদিন বাঁচব ততদিন ভাল করে বাঁচতে চাইব।

ভাল করে বাঁচা মানে নিজের মতো করে বাঁচা। যার যেটা কাজ, যেটি করে আনন্দ পাই, সেটি সর্বান্তঃকরণে করার নাম ভাল করে বাঁচা। অমনোযোগে খাপছাড়া করে কাজ করলে বাঁচাটাও কেমন যেন খাপছাড়া অমনোযোগী বাঁচা হয়ে যায়। যে যত ভাল করে বাঁচব, সে তত বেশি করে বাঁচব। পৃথিবীটা তার তত বেশি করে আপনার হয়ে যাবে। বয়স্ক তরুণ যাঁদের নাম করলুম, তাঁরা সব্বাই অমনি।

আর ওই যাঁরা মিছিল করে অন্য ভুবনে চলে গেলেন? তাঁরাও প্রত্যেকে সর্বান্তঃকরণে বেঁচেছিলেন, ভাল করে, বেশি করে বেঁচেছিলেন। তাই তো তাঁদের অভাবও বেশি বেশি। ঠিক করে বেঁচে থাকা হয়নি ব্যাধির দৌলতে, একা প্রণবেন্দুর।

কিন্তু কবিরা মরে না।
ভাল থেকো। ভাল থাকা যায়।
ইচ্ছের মুঠোতে রাখো
ভাল থাকা, এবং না থাকা।

সময় ফুরায়।

তবুও অশোকফুল লাল হয়ে ফোটে।

১২.০১.০৮

ছবি তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

গানবাজনার দু-চার কাহন

এই উল্টোসোজা জীবনখাতার পাতা উল্টোনোর প্রক্রিয়ায় গানবাজনাটা তাঁর কাছে একটি অতি আরামদায়ক লুব্রিক্যান্ট। আর গান শোনার চেয়ে নাকি ভাল অনিদ্রার ওষুধ আর নেই। গান শুনেই তিনি কাটিয়ে দিয়েছেন একটা আস্ত জীবন। এই রোববার-এর জলসাঘর-এ সাধের জ্যুকবক্সে কান পাতলেন

অশেষ চট্টোপাধ্যায়

'যে গান ভালবাসে না, সে মানুষ খুন করতে পারে।' দীর্ঘ সময়ের নাফথলিনের গন্ধ জড়ানো শাল-দোশালা জড়িয়ে এমনই একটা প্রবচনসদৃশ বাণী চালু আছে। শোনা যায়, এটি নাকি কোনও কবির উপলব্ধিপ্রসূত পংক্তি। হতে পারে। কবির মন সঠিকভাবে বাঁধা সেতার। অনুভূতির ঘাত-প্রতিঘাতে—তা সে গভীর বেদনা বা উচ্ছ্বসিত আনন্দ, যাই হোক না কেন—ঠিকরে দিতে পারে সত্য ঝলক, যা সহজে মেলায় না; তার আভা ছড়িয়ে থাকে দীর্ঘকাল ধরে।

এই বাণীটির প্রতি আমার বিশ্বাস বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে। তালিবানদের কাছে সঙ্গীত অথবা সবরকম শিল্পকলা খ্যাপা ষাঁড়ের সামনে আন্দোলিত লাল কাপড় বিশেষ। এই মানসিকতা এখন আর একটি বিশেষ ধর্মীয় মতধারাদের চূড়ান্ত অসহিষ্ণু, উগ্রবাদী অংশতেই সীমাবদ্ধ নেই। ধর্ম ও ভৌগোলিক সীমানা টপকে ছড়িয়ে গিয়েছে দেশে দেশান্তরে। লক্ষ্য একটাই যেন তেন প্রকারেণ ঐতিহ্যবাহী সঙ্গীতকে ভেঙেচুরে তছনছ করে দেওয়া। একটা ভয়ঙ্কর পরিবর্তন, কিন্তু ক্রমবিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নয়, জেনেবুঝে আচমকা ভেঙে ফেলে। চরৈবেতি বলে এগনো নয়, স্কেটিং শু পরে আশি ডিগ্রি কোণ বরাবর লাফ দেওয়া। তার নিট ফল—সঙ্গীত থেকে সুর তথা মেলডিকে ব্যাক বেঞ্চে নয়, একেবারে ক্লাসরুম থেকে বের করে দেওয়া। ব্যাপারটা যে খুব সহজ, তা নয়। তার মধ্যেও নানান প্যাঁচ, ফান্দা আছে। এতেও গলার কারিকুরি কম লাগে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাতে রইল পেনসিল। একটার পর একটা নাম্বার পদ্মপাতায় জল হয়ে গড়িয়ে যায়। 'শেষ গানেরই রেশ' বলে মনে—মানে আমার মতো পরম্পরায় বিশ্বাসী শ্রোতার মনে—কোনও কিছু থাকে না।

বিশুদ্ধ তালিবান হলে বড়ে গোলাম আলি আর ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের বামিয়ানের জোড়া বুদ্ধমূর্তির হাল হত। এই নব্য তালিবানরা—টিভি-র নানান প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে এদের ক্রমবর্ধমান দাপট—এত হইহুল্লা করেও নতুন প্রজন্মের শ্যামল, মানবেন্দ্র, হেমন্ত, কিশোর, মান্না দে-র কোনও ছায়াও সৃষ্টি করতে পারেননি। আসলে যুগটাই অস্থির, প্রতিযোগিতাও প্রবল, ইঁদুর ছুট-এর হতে-চাওয়া তীরন্দাজের সংখ্যাও ফেঁপে ওঠা দুধ—প্রায়ই উপচে উনুনে পড়ে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। ধৈর্য, সময়, দুই-ই কম। সবাই চায় শর্টকাটে কেল্লা ফতে করতে। পরিচ্ছন্ন, গভীর, মাধুর্যের রসে চোবানো গলায় কবচকুণ্ডল নিয়ে আর ক'জন জন্মায়। যদি হয়, তাহলে ক্বচিৎ সৌভাগ্যবান (বা বতী) একশো মিটারের দৌড়ে পঁচাত্তর মিটার এগিয়েই থাকেন। নিষ্ঠা আর লক্ষ্যবস্তু সম্বন্ধে সঠিক ধারণার জোড়া তিলক যদি কপালে থাকে, সাফল্য তাহলে ফিনিশিং লাইনে এগিয়ে নিয়ে যায়। যেমন কিশোরকুমার। তিনি কারুকে অনুকরণ করেননি। অথচ তাঁর কণ্ঠের কার্বন কপি অজস্রধারায় তাঁর তিরোধানের বহু পরেও সমানে বেরিয়ে চলেছে।

অবশ্য একটা দৈবী ব্যাপারও আছে। ওই যে কথায় বলে না—অতি বড় সুন্দরী না পায় বর। এইরকম এক চাঁদ পোড়াকপালেকে আমি আবিষ্কার করেছিলাম বহু বছর আগে কলকাতার এক বড় হোটেলের পানশালায়। ঘরের ডিফিউজ্‌ড লাইট এতই স্তিমিত যে, মেনু কার্ডটা কোনওরকমে পড়া যায়। চড়া সুরে ব্যান্ড বাজছে, সঙ্গে কখনও গায়িকা, কখনও গায়ক। সবই তখনকার বাজারচলতি হিন্দি ফিল্মি গান। সঙ্গী বন্ধুর সঙ্গে মৃদুমন্দ কথোপকথন, গেলাসে তৃতীয় পেগের উচ্চতা কড়ে আঙুলের প্রস্থ, অনর্গল ঝপরঝাঁই ব্যান্ডের কলকোলাহল—এক নিমেষে কুর্নিশ করে সরে গিয়ে ঘরটাকে তারাভরা আকাশের নীচে বিস্তীর্ণ প্রান্তর করে দিল। এই জাদুটি ঘটাল এক গায়ক। আরে, এ তো জিম রিভ্‌স, গানটাই শুধু হিন্দি। দা সেম ডিপ, ক্লিয়ার, বুমিং, রিচ, ব্যারিটোন ভয়েস, যা এ দেশের মাটিতে দুর্লভ বলেই জানতাম। পরে বেয়ারাকে দিয়ে গায়ককে ডাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—এই গলা নিয়ে আপনি এইখানে গান গাইছেন? গায়ক, বছর তিরিশের আশপাশে বয়েস, জবাবে বলেছিলেন—আমিও এই প্রশ্নটা নিজেকে করি।

বয়েস মানুষের শরীর প্রথম বিশ-বাইশ বছর ধরে একটু একটু করে তৈরি করে। তারপরই শুরু ভাঁটা আর সেই শরীরেরই ভাঙন। এই দ্বিতীয় পর্বের সূত্রে দুটি উপহার প্রাপ্তি হয়েছে আমার ব্লাড প্রেশার এবং অনিদ্রা। তার সঙ্গে ধরেছে আরেকটি ব্যাধি—নস্টালজিয়া। ফাঁক পেলেই উর্দু বই পড়ার স্টাইলে অলিখিত জীবনলিপি পড়া বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সকলেরই হয়। আমারও হয়েছে। তবে 'মনে কর শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর' গানটিকে এখনকার চলমান জীবনের থিম

মিউজিক করার ইচ্ছে—যা প্রায় সব বয়স্ক লোকজনের প্রায় জপমন্ত্র হয়ে যায়—সেরকম কিছু হয়নি। অন্তত এখনও পর্যন্ত নয়।

এই উল্টোসোজা জীবনখাতার পাতা উল্টোনোর প্রক্রিয়ায় গানবাজনাটা আমার কাছে একটি অতি আরামদায়ক লুব্রিক্যান্ট-এর কাজ করে। আর গান শোনার চেয়ে ভাল অনিদ্রার ওষুধ আর নেই। চোখ বুঁজে তাবৎ ঘুম-ঘুম খেলার সহমর্মী খেলুড়েদের 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' চলনে স্লোগানের মতো বলি নিজের রুচিমতো গান শোনো। নিদ্রাসুখ না হোক , নাকের বদলে নরুনের মতো প্রচুর স্বস্তি, সেই সঙ্গে একটা ঘুমের ময়ান দেওয়া দীর্ঘ বিশ্রাম, শরীর আর মন দুই-ই পাবে। পাবেই। যা অন্তত জীবনে পরশুরাম লিখিত 'অটলবাবুর অন্তিমচিন্তা' গল্পটির আবির্ভাব অবশ্যই বিলম্বিত করবে। উল্টে গাইতে ইচ্ছে করবে—'আসা-যাওয়ার পথের ধারে/গান গেয়ে মোর কেটেছে দিন'। গান গেয়ে না হয়ে গান শুনেই না হয় হল, তাতে লাভ বই ক্ষতিটা কী? অতএব পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

আজকাল জিন নিয়ে নানান কথা শোনা যায়। জেনেটিক স্ট্রিক দু-তিন পুরুষ শীতকালের ভাল্লুক ঘুমের পর নাকি হঠাৎ হঠাৎ চাগাড় দিয়ে ওঠে। পরবর্তী প্রজন্মের কারুর মধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্নর প্রতিভার বিস্ফোরণ ঘটায়। জ্ঞান হয়ে অবধি দেখেছি গানবাজনা আমাকে টানে, সম্মোহিত করে। কিন্তু প্যারাডক্সিকালি এনাফ, আমার পিতৃকুল, বিশুদ্ধ ঘটি, হাড়ে রক্ষণশীল, আদিতে সংস্কৃতজ্ঞ টুলো পণ্ডিত, পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট (উনবিংশ শতাব্দীর সাতের দশকে), জেলা জজ, বাদবাকি আইনজীবী—সবাই সঙ্গীতে দন্ত্য 'স'-জ্ঞানশূন্য। একমাত্র খাওয়া আর হাইতোলা ছাড়া হাঁ করেননি কেউ। আমার আগাগোড়া প্রেসিডেন্সি কলেজপ্রসূত ঠাকুরদা ও জ্যাঠা-কাকাদের মধ্যে একমাত্র জেসুইট ফাদারদের কাছে লালিত আমার সেন্ট জেভিয়ারি বাবার কিন্তু একটা পরোক্ষ সঙ্গীতপ্রীতি ছিল। জন্মাবধি দেখে আসছি 'টকোফোন' নামে এক বিচিত্র ব্র্যান্ডের বিশাল একটি চোঙাওয়ালা একটি গ্রামোফোন আর গাদাগাদা পিচবোর্ডের বাক্সভর্তি রেকর্ড আর লাল রঙের টিনের ঘেরাটোপে বন্দি নানান পালার সম্ভার—সতী বেহুলা, সাবিত্রী-সত্যবান এই জাতীয়। আমার শান্তশিষ্ট, অতীব মৃদুভাষী আইনজীবী বাবা ছেলেদের লেখাপড়া ধ্বংসকারীজ্ঞানে বাড়িতে রেডিও ঢুকতে দেননি। কিন্তু দাদা-দিদি কলের গান চালালে কিছু বলতেন না, বরং গড়গড়ার নল মুখে দিয়ে নিজেও শুনতেন কখনও কখনও

এই রেকর্ডগুলো থাকলে আজ কালেক্টরস আইটেম হত। মনে পড়ে রেকর্ডের খাপের ওপর তখনকার বিখ্যাত গায়ক-গায়িকাদের মস্ত মস্ত ছবি—এইচএমভি রেকর্ডে মিস আঙুরবালা/ইন্দুবালা/আশ্চর্যময়ী দাসীর গান শুনুন। মনে পড়ে মাঝখানে সিঁথিকাটা চুল, বেশ পুরুষ্ট গোঁফ, মাংসল মুখ, স্যুটপরা প্রোফেসর (কীসের?) বিমল গুপ্ত-র গান শোনার জন্যে অনুরোধ। এই বিস্মৃত বিমল গুপ্ত—তাঁর কণ্ঠস্বর মনে নেই—কিন্তু দুই বিখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক ভ্রাতা কমল দাশগুপ্ত আর সুবল দাশগুপ্তের অগ্রজ। মনে পড়ে হিন্দুস্থান রেকর্ডে কুমার শচীন দেব বর্মন বি.এ.-র গাওয়া 'ওরে সুজন নাইয়া' গানটি। তখন ঝপাঝপ বিক্রি এই রেকর্ডটি-র একটি বাড়তি চমক আমাকে মুগ্ধ করেছিল সেই ছোটবেলাতেই। হাওয়াইয়ান

গিটার বাজনাটি গানের আবহসঙ্গীতে এই প্রথমবার ব্যবহার করা হয়। রেকর্ডের লেবেলের ওপর ছাপা ছিল—উইথ স্পেশ্যাল গিটার অ্যাকমপ্যানিমেন্ট বাই মিস্টার সুজিত নাথ। এই দেশে বাজনাটির বিচিত্র কর্ড এবং হার্মনির সমাহার এবং দীর্ঘস্থায়ী মীড়-এর মাধুর্য সর্বপ্রথম প্রবাহিত করেন পরবর্তীকালের প্রখ্যাত এই গিটার শিল্পী। এরই জন্যে কাগজে পাত্রপাত্রী কলামে পাত্রীর গুণবর্ণনায় 'গিটারে পারদর্শিনী' কথাটা আজও—সম্ভবত সত্তর বছর পরও—বিজ্ঞাপিত হয়। সেই আকর্ষণ থেকে এই বাজনাটি পরে নিজে বাজাতে শুরু করি। কলেজ জীবনে সিগারেট আর বই কেনার টাকা জোগাড় করতাম বাজনাটি শিখিয়ে। এ ছাড়াও বাজাতাম এস্রাজ আর বেহালা। গানও শিখেছি, কিন্তু গানের টিউশানি কখনও করিনি। আর করিনি বছর পাঁচেক স্কুল মাস্টারি করেও লেখাপড়ার টিউশানি। যদিও নানান নাচের গ্রুপের সঙ্গে বেহালা বা গিটার বাজিয়ে খুচখাচ খেপও মারতাম। আর গানবাজনা শোনা? নানান উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত কনফারেন্সগুলো আমাকে টানত, যেমন ব্রাউন শুগার টানে তার নেশাড়ুকে, তেমনই। এই পর্বের শেষ হল গত শতাব্দীর ষাটের দশকের গোড়ায়—স্কুল মাস্টারি ছেড়ে ইংরিজি খবরের কাগজে খবর কুড়ুনের পাকা চাকরি নিলাম যখন।

রাধাপ্রসাদ গুপ্তমশাই কলকাতার থেকে চিরকালের জন্যে ফেরারি ফেরিওয়ালাদের ডাক নিয়ে স্মৃতি কণ্ডুয়নের প্রভূত উপকরণ রেখে গিয়েছেন। এই 'অবাক জলপান' 'কুলফি মালাই' 'কোপানি মিট্টি লেবে গো', 'চাই ভাজা মুঙ্গ ডাল'—এর সঙ্গে নির্মম সময় ডেকে নিয়ে গিয়েছে গানবাজনার নানান পথচলতি কোলাজ। গত চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের মধ্যে কেউ কখনও সত্য পীরের পাঁচালি গান শুনেছেন? কিংবা ভোরবেলা নগর সংকীর্তন? মস্ত বড় পেতলের প্রদীপ হাতে কালো জোব্বাপরা, বিশাল দাড়িগোঁফ মুশকিল আসানরাই বা কোথায় গেল?। এরা ছাড়াও, ছিল আঙুলে মন্টু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঝিলিকে, সিঙ্গল রিডের হারমনিয়মে ঝড় তোলা লোকটির সঙ্গে তার ঘাঘরা-চোলিপরা গায়িকা সঙ্গিনীর জোড়। আমার বাল্যকাল জুড়ে আছে হঠাৎ হঠাৎ রাতের আকাশ চিরে সুরের সুধারস ঝরানো এক জাদু বেহালা বাজিয়ে। এই বাজনাটির প্রতি আমার দুর্নিবার আকর্ষণের উৎস সেই আশ্চর্য শিল্পী। বাজনাটি পরে নিজেও বাজিয়েছি বলে বুঝি, মনের ভেতরে সুরের কতখানি প্রশান্ত মহাসাগরীয় গভীরতা আর আঙুলের দক্ষতা থাকলে খোলা আকাশের নীচে অতখানি জোরালো অথচ মখমলি মসৃণ টোনাল কোয়ালিটি যন্ত্রটি থেকে আদায় করা যায়। 'আমার কি বেদনা তুমি জান, ওগো মিতা সুদূরের মিতা।' কোন সে গভীর বেদনার ক্ষত থেকে মন ছিঁড়েখুঁড়ে বেরত সেই মায়ালোকের তীব্র আর্তি? এ দেশে যাঁরা নামীদামি বেহালা- বাজিয়ে আছেন, সেই টোনাল কোয়ালিটি তাঁদের কারুর মধ্যে শুনিনি। এই ম্যাজিকটা তখনই হত, যখন চলতি ফিল্মি গান ছেড়ে লোকটা আপনমনে ইমপ্রম্পটু বাজাত।

তখনও পর্যন্ত নাইজেল কেনেডি বা আইজাক পাহরম্যান বা ডেভিড অবস্ট্রাখ তো দূরের কথা, সেকালের ছোটদের মাসিক 'মৌচাক'-এ ইয়েহুডি মেনুহিন-এর গল্পও বোধহয় পড়িনি। সেই অনামা বাজিয়ে কিন্তু শীতকালেও অসময়ে বাজিয়ে পাড়াকে পাড়া মন্ত্রমুগ্ধ করে দিত। কেউ তাকে সেই সস্তাগন্ডার বাজারে, তামার পয়সা ঠেকিয়ে অসম্মান করেনি। আনি, দোয়ানি, সিকি, আধুলি এমনকী আস্ত টাকাও দিত। লোকটি কিন্তু কখনও কিছু চাইত না।

একবারই তাকে দিনের বেলায় দেখি। পাড়ার একটি মাত্র গ্র্যান্ড পিয়ানো শোভিত বাড়ির বিলেত ফেরত ইঞ্জিনিয়ার কর্তা তাকে ঘরে ডেকে আপ্যায়ন করেছিলেন। কাঁচাপাকা ঝাঁকড়া চুল আর গোঁফদাড়িতে ঢাকা মুখ, ময়লা কোটপ্যান্টপরা ঘনশ্যাম বর্ণ, ভারিসারি চেহারার লোকটির কাছ থেকে জেনেছিলাম—যুদ্ধের ধাক্কায় সিঙ্গাপুর থেকে উচ্ছেদ হয়ে কলকাতায় এসে ঠেকেছে। সেদিন চা-টা খেয়ে বাজাল এক ভৈরবী ধুন। যা সামনাসামনি দেখে তাজ্জব হয়েছিলাম, সেটা তার বেহালার হাল ছড়ের অর্ধেক বালামচি মিসিং, ছড় থেকে রজনের গুঁড়ো পড়ে ব্রিজের নিচের অংশটায় সাদা কোটিং পড়ে গিয়েছে। এত অযত্নে রাখা বাজনা, তবু তার জাদুকর হাত ঠিকই নিংড়ে বের করে নিচ্ছে সুরের প্রস্রবণ। হ্যামলিনের সেই অলৌকিক বাঁশিওয়ালার মতো সেই নাম-না-জানা বেহালাদার তার জাদুবেহালা নিয়ে কোন অমরায় সুরের ফেরি করছে ,কে জানে!

আমার উনিশ-কুড়ি বয়েসের বন্ধু, কিছুটা পরুষভাষী, চশমাপরা ইস্তক বক্সিং রিং থেকে ছটকে কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক অশোক, কথায় কথায় একটি হাইকু-মার্কা কবিতার গুলতি ছুড়েছিল—প্রেমট্রেম সব মিছে, এ জীবন কাঁকড়া বিছে। কথাটির সারবত্তা জীবনে বহুজন উপলব্ধি করেছেন। আমিও। (বিটোফেন দুমদাম প্রেমে পড়তেন এবং পরে হুলের জ্বালায় জ্বলতেন বলে বিয়েটাই করা হল না জীবনে।) তবুও মনের কক্ষপথ আচমকা ঘুরিয়ে দিতে নারীর একটা ভূমিকা থাকেই। ক্লাস সেভেন কি এইটে পড়ি তখন। তালেগোলে একবার বিকেল থেকে ভোর অখণ্ড বাংলার সিরাজগঞ্জ শহরে থাকতে হয়েছিল। সন্ধেবেলায় দেখেছি সুবিশাল মেঘনা নদীর ওপর স্টিমার ঘাট। ওপারে জগন্নাথগঞ্জ ঘাটের আলোর ফুটকি, অন্ধকার ফুটো করে। তারপর স্থানীয় এক স্কুলের ফাংশানে গান শুনতে গিয়েছিলাম। ওখানকারই একটি মেয়ে গাইবে। বেশ নামডাক হয়েছে তার। লোকজন তার সুরেলা গলার প্রশংসায় মশগুল। যথা সময়ে স্টেজে উঠল মেয়েটি। অত দূর থেকে চেহারার আন্দাজ বিশেষ পাইনি। তবে ফর্সা রং, বয়েস কুড়ির আশপাশে বলে মনে হয়েছিল। তানপুরার গুঞ্জন ছাপিয়ে মেয়েটি সুর লাগাতেই উৎকর্ণ হলাম। কোনও মেয়েকে খোলা আসরে ক্লাসিকাল গান গাইতে এর আগে কখনও শুনিনি। পরিষ্কার, ভরাট, আশ্চর্য সুন্দর গলা আমাকে একটু একটু করে সুরের রূপসাগরে ডুবিয়ে দিল। গান শেষ হতে হাততালির পায়রা-ওড়ানো শব্দে চেতনার খোলা হাওয়ায় ভেসে উঠলাম। পেলাম এক অরূপরতন : ক্লাসিকাল গানের প্রতি আজও অবিচল

ভালবাসা। রাগ বাগেশ্রীর এই খেয়াল শুনে আমার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সুরলোকে প্রথম প্রবেশ। বন্দিশটি—কথা বুঝতে পারিনি—কিন্তু এখনও মনে আছে।

গায়িকার নাম বাঁশরী চক্রবর্তী, যিনি পরে সুগায়ক অপরেশ লাহিড়িকে বিয়ে করে বাঁশরী লাহিড়ি নামে হালকা বাংলা গানে যথেষ্ট নাম করেছিলেন। এঁকে জীবনে আর কখনও দেখিনি। তবু পরলোকগতা এই গায়িকার স্মরণে মনে হয়—'তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে।' তাঁর কৃতী পুত্র, প্রখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক বাপি লাহিড়ি—এঁর সঙ্গেও পরিচয় নেই। তিনিও জানেন না—জানার কথাও নয়—তাঁর মায়ের কাছে আমি কতটা ঋণী।

বাড়িতে রেডিও নেই। বাল্যসঙ্গী সামনের বাড়ির বাবলির বাড়িতে একটি বিশাল ফিলিপস-এর ভালভ সেট ছিল। পাড়ার ছেলেরা শনিবার দুপুরে অনুরোধের আসর শুনত। সে বাড়িতে অবাধ প্রবেশের পারমিট থাকায় আমি ড্রয়িং রুমে—বেশিরভাগ সময়েই খালি থাকত—ঢুকে পড়ে সকাল-সন্ধ্যা-রাত্তির ফাঁক পেলেই শুনতাম ধ্রুপদ-ধামার, খেয়াল, ঠুংরি, সরোদ, সেতার। বাবা মারা যাওয়ার বছর দুই পরে, তখনও আমি স্কুলের গণ্ডির

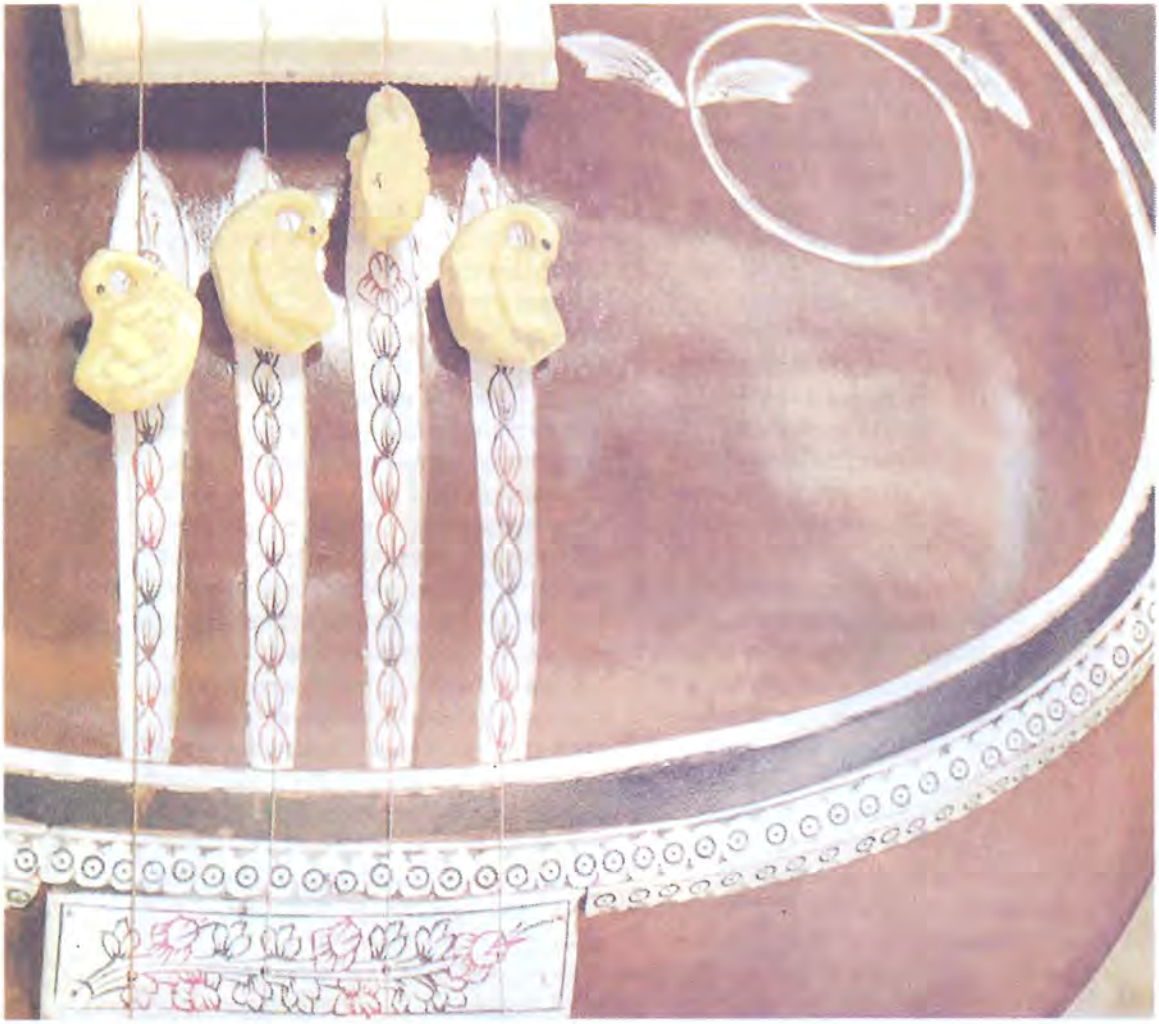

মধ্যে, নিজেদের বাড়িতে একটি আট ব্যান্ডের মার্ফি রেডিও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রেডিও শোনার জন্যে আর হাঘরে হতে হয়নি।

আমি যে গানবাজনায় সুযোগ এবং একাগ্রতাসহ লক্ষ্যস্থির করতে পারলে ধাপে ধাপে এগোতে পারতাম, তার একটা আবছা আভাস পেয়েছিলাম ছ'বছর বয়েসে। দিদির বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর তার ফেলে যাওয়া হারমোনিয়মটিতে কৌতূহলী প্যাঁ পোঁ করতে গিয়ে নিজেই তাজ্জব—আরে, কী আশ্চর্য! আমি তো যে গান বাজাতে চাই, তাই বাজাতে পারি। বেপর্দায় হাত পড়লে ভেতর থেকেই সঠিক পর্দাটি খুঁজে নেওয়ার নির্দেশ আসে। আরও পরে তারের বাজনা বাজাতে গিয়েও সেই একই ব্যাপার। এস্রাজ, গিটার এমনকী বেহালার মতো ঘাট-বিহীন যন্ত্রেও আঙুল বেসুরকে সরিয়ে সুরের সঠিক রাস্তা ঠিকই খুঁজে নেয়। স্বরলিপি দেখে বিনা হারমনিয়মেই সোজাসুজি গান গলায় তুলে নিতে পারি। তবে ধৈর্য নেই, তাই প্র্যাকটিস তথা রেওয়াজের নামে জ্বর আসে। অগত্যা সমঝদার জ্যাক অফ অল ট্রেড্‌স লেবেল নিয়ে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাই জীবনের এখন থিম মিউজিক—'গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি/তখন তারে চিনি, তখন তারে জানি।' তার আনন্দও কম নয়। বিশেষ করে অনিদ্রা যখন আমার ঘরণী। বাই দা বাই, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের এক নক্ষত্র, তারাপদ চক্রবর্তী মশাইও জীবনের শেষের বছরগুলো এই একই দেবীর অনুগ্রহে রাত কাটাতেন তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে, অর্ধশায়িত অবস্থায়। শোওয়ার চেয়ে এই অবস্থানেই তিনি বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন; ঘুম নামের ইস্টিশান তার নাগালের বাইরে বলে জানতেন। আমারই পাড়ার একদা বাসিন্দা, বহু প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে দরিদ্র তবলচি থেকে প্রতিষ্ঠিত গায়কের শিরোপা আদায় করা, প্রচণ্ড আত্মাভিমানী, এই বড় মনের শিল্পীর স্নেহের প্রসাদকণা পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার, সেই বালক বয়েসেই। তিনি আমায় বিনা পয়সায় তাঁর কাছে গান শেখার সুযোগ দিতে চেয়েছিলেন। চোদ্দ বছরের পিতৃহীন বালক পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতার জন্যে তাঁর সেই দাক্ষিণ্যগ্রহণে অক্ষম ছিল; মাঝখান থেকে ওঁর বাড়িতে গানের ক্লাসের বাইরে দাঁড়িয়ে শুনে শুনে শেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলাম, লজ্জায় সঙ্গীতাচার্যের কাছে মুখ দেখাতে পারব না বলে।

পাশ্চাত্য উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত মোৎজার্ট প্রথমেই চেনা

দিয়েছিলেন এক অকল্পনীয় চাইল্ড প্রডিজি হিসেবে। ভাগনার সেই অনুপাতে কিছুটা লেটলতিফ। লেখক হবেন, না কম্পোজার হবেন—এই দোলাচল চিত্ততায় ভুগেছিলেন উনিশ বছর বয়েস পর্যন্ত। ভাগ্যিস লেখক হতে চাননি, তাই জার্মান অপেরা সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁর নানান কালজয়ী সৃষ্টিতে।

এই মহান দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও আমি হেন উচ্চিংড়ে যে, লক্ষ্মোর তিনটে হ্যান্ডেল সামনে থাকা সত্ত্বেও একটাও পাকড়াতে পারল না। না হল গাইয়ে-বাজিয়ে, না পারল ছবি আঁকতে। কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার মাঝখানে গভর্নমেন্ট কলেজ অভ আর্টস-এর ঘাটে স্বল্পকালের জন্যে আমার অকিঞ্চিৎকর ডিঙি নৌকোটি ভিড়িয়েছিলাম। সেখানে ভর্তি পরীক্ষায় প্রখ্যাত শিল্পী গোপাল ঘোষ আমার এক্সেম দেখে বলেছিলেন, আমি চাইলে উনি প্রিন্সিপাল রমেন চক্রবর্তীকে আমাকে সোজাসুজি সেকেন্ড ইয়ারে ভর্তির জন্যে সুপারিশ করতে পারেন। নিজেরই মতিস্থির ছিল না, তাই রাজি হইনি।

খেয়াল গানের কথা উঠলে আমির খাঁ আর বড়ে গোলাম আলি খাঁ সাহেব এই দুই ভিন্ন ঘরানা আর আকৃতির মাউন্ট এভারেস্ট সময়ের তাবৎ কুয়াশা হটিয়ে জাহির হবেই। দু'জনের গানই শোনার সৌভাগ্য হয়েছে বহুবার। আমির খাঁ সাহেবের পদস্পর্শ করার সৌভাগ্য হয়েছিল একবার। আমার বছর তিনেক গানের তালিম এঁরই এক সাগির্দ উষারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের কাছে। তখন কলকাতায় খাঁ সাহেবের যে কোনও অনুষ্ঠানে তাঁর দুই প্রিয় শিষ্য, উষারঞ্জন আর সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় তানপুরা ছাড়তেন। একবার এক প্রোগ্রামের শেষে আমার অনুরোধে উষাদা আমাকে গ্রিনরুমে নিয়ে গেলেন। ছ'ফুটের ওপর লম্বা, দিব্যকান্তি, রিমলেস চশমাশোভিত খাঁ সাহেবকে প্রণাম করলাম। উষাদা বললেন, 'আমার কাছে গান শেখে।' প্রসন্ন হেসে মাথার ওপর হাত ছোঁয়ালেন। 'পুণ্য হল অঙ্গ মম ধন্য হল অন্তর।' ভেতরে নিষ্ঠা নেই, তাই খাঁ সাহেবের আশীর্বাদী হাতের ছোঁয়াতেও এক অভিজ্ঞতা ছাড়া আমার আর কিছুই লাভ হয়নি।

বড়ে গোলাম আলি খাঁ সাহেবের সামনাসামনি বসে গান শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার এক নিকট বন্ধু, প্রয়াত প্রখ্যাত অভিনেতা অনিল চট্টোপাধ্যায়ের দাক্ষিণ্যে। রিচি রোডে অনিলের তখনকার ভাড়া বাড়ির গানবাজনার শৌখিন বাড়িওয়ালার আয়োজিত এক ঘরোয়া বৈকালিক আসরে। একটি মাঝারি ঘরে গালচের ওপর জনা বিশ-বাইশ শ্রোতা। প্রথম খাঁ সাহেবের সঙ্গে চেহারা ও মেজাজে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী, কণ্ঠসঙ্গীতের এই সাড়ে তিন সপ্তকী বিগ্রহ গেয়েছিলেন ভীমপলশ্রী। সেই গানের বর্ণনা করলে লেখা বড় হয়ে যাবে। তবে মনে হচ্ছিল, ওইটুকু ঘর সেই বিপুল কণ্ঠসম্পদকে ধরে রাখতে কত অক্ষম। খাঁ সাহেবের বিখ্যাত ঠুংরি, 'ক্যা করু সজনী আয়ে না বালাম' এক সময় সব আসরেই তাঁকে গাওয়ার জন্যে শ্রোতারা পেড়াপিড়ি করতেন। এমনই এক অনুষ্ঠানে অজস্র অনুরোধ সত্ত্বেও খাঁ সাহেব ওই বিশেষ ঠুংরিটি বাদ দিয়ে অন্য গান গাইছেন। ওদিকে শ্রোতারাও নাছোড়বান্দা—তাঁরা 'আয়ে না বালাম' শুনবেনই। শেষ কালে খাঁ সাহেব ক্ষেপে গিয়ে একরাশ বিরক্তি উগরে দিলেন—আরে এতনা উমরমে বালাম ক্যায়সে আয়েগি বাতাও। ব্যস, এক ধমকে সবাই ঠান্ডা।

সঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজকদের মধ্যে কখনও কখনও দু-একজন সঙ্গীতভীষণ থাকেন। এমনই এক অনুষ্ঠানে শেষ রাত্তিরে আলি আকবর খাঁ সাহেব 'মিশ্র রাগ যোগিয়া-কালাংড়া' বাজাবেন বলে জানালেন। দু'টি রাগই ভৈরব ঠাটের। পর্দাও এক। তবে চলনে বিস্তর ফারাক। আরোহনে গান্ধার নিষাদবর্জিত যোগিয়ায় অবরোহণে দুর্বল গান্ধার মধ্যমকে ছুঁয়ে ক্ষীণ অস্তিত্বের জানান দেয়। কালাংড়ায় আবার গান্ধার অতি প্রবল। সে যা হোক, যোগিয়া-কালাংড়া ঘোষকের উচ্চারণে শোনাল—যোগিয়া কা ল্যাংড়া। খাঁ সাহেব রাগের নামের মধ্যে খঞ্জত্বের অনুপ্রবেশে প্রথমটা চমকে গেলেও পরে হেসে ফেললেন। শ্রোতারাও, তবে সকলেই বুঝে নয়।

আরেকবার। সন্ধ্যার এক আসরে আলি আকবর খাঁ সাহেব বাজাচ্ছেন পুরিয়া। যেভাবেই হোক, সরোদের ছ'টি তারের মধ্যে পঞ্চমে বাঁধা একটি তার বেমক্কা ঘটাং করে লেগে গেল। অথচ পুরিয়া পুরোপুরি পঞ্চমবর্জিত রাগ। পরিষ্কার দেখলাম মুদিতনেত্র খাঁ সাহেব চোখ খুলে মাথা ঝাঁকালেন তারপর অনায়াস দক্ষতা এবং মমতায় সেই অনধিকার প্রবেশকারী পঞ্চমকে বাজনার চৌহদ্দির মধ্যে এনে পুরিয়া রাগকে রূপান্তরিত করলেন পুরিয়া কল্যাণ রাগে, যাতে পঞ্চমকে আর অচ্ছুৎ বলে মনে না হয় বাজানোর শেষে অবশ্য যথারীতি ঘোষণা হল—এতক্ষণ পুরিয়া রাগে সরোদ বাজিয়ে শোনালেন আলি আকবর খাঁ।

পরবর্তী প্রজন্মের খেয়ালিয়াদের মধ্যে আমার প্রিয় পণ্ডিত যশরাজ আর রশিদ খান। যশরাজ, যার অনন্য কণ্ঠমাধুর্যে এবং সঞ্চালনে এখন ঈষৎ বয়েসের মরচে ধরেছে, তাঁর সঙ্গে কৈশোরোত্তর বয়েসে বেশ প্রীতির সম্পর্ক ছিল। ওরা থাকত ভবানীপুরে আশুতোষ মুখার্জি রোডে দোতলায়, এখন যেখানে দেনা ব্যাঙ্কের একটি ব্রাঞ্চ আছে। ওরাও এক হিসেবে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিল কলকাতায়। অন্য কিসিমের উদ্বাস্তু। তখনও দেশীয় রাজ্য হায়দ্রাবাদকে তার অধিপতি নিজাম বাদবাকি ভারতবর্ষের সঙ্গে মেলাতে একেবারেই নারাজ, যদিও তাঁর প্রজারা চান ঠিক তার উল্টোটা। তাই বিদ্রোহী প্রজাদের ওপর হানাদার হিসেবে রাজাকার বাহিনী লেলিয়ে দেওয়া হল। এই রাজাকারদের হানায় ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়ে বংশানুক্রমিক গায়ক যশরাজের দাদা প্রখ্যাত খেয়ালিয়া পণ্ডিত মণিরাম সপরিবারে পালিয়ে এলেন কলকাতায়। এবং অচিরেই এখানে যথেষ্ট খ্যাতি, ছাত্রছাত্রী, প্রতিপত্তি পেলেন। এদের দু'ভাইয়ের মাঝে আরেক ভাই, পণ্ডিত প্রতাপ নারায়ণ। তিনিও ভালই গাইতেন।

পণ্ডিত মণিরামজির বাইরের প্রশস্ত ঘরটিতে সকাল-সন্ধ্যা নিত্য পূজার মতো গানের চর্চা হত। তাবৎ সঙ্গীতপ্রেমীর সেখানে অবাধ প্রবেশাধিকার। এভাবেই যেতে যেতে সমবয়েসী যশরাজের সঙ্গে আলাপ। অবশ্য হাইফেন-এর কাজ করেছিল ওদের তবলচি, মহারাষ্ট্রের ছেলে আনন্দ বোড়াস। আনন্দ পরে আকাশবাণীর স্টাফ আর্টিস্ট হয়ে, বাঙালি মেয়ে বিয়ে করে শিলিগুড়িতে ঘরবাড়ি বানিয়ে পাকাপাকি পশ্চিমবঙ্গীয় হয়ে গিয়েছে।

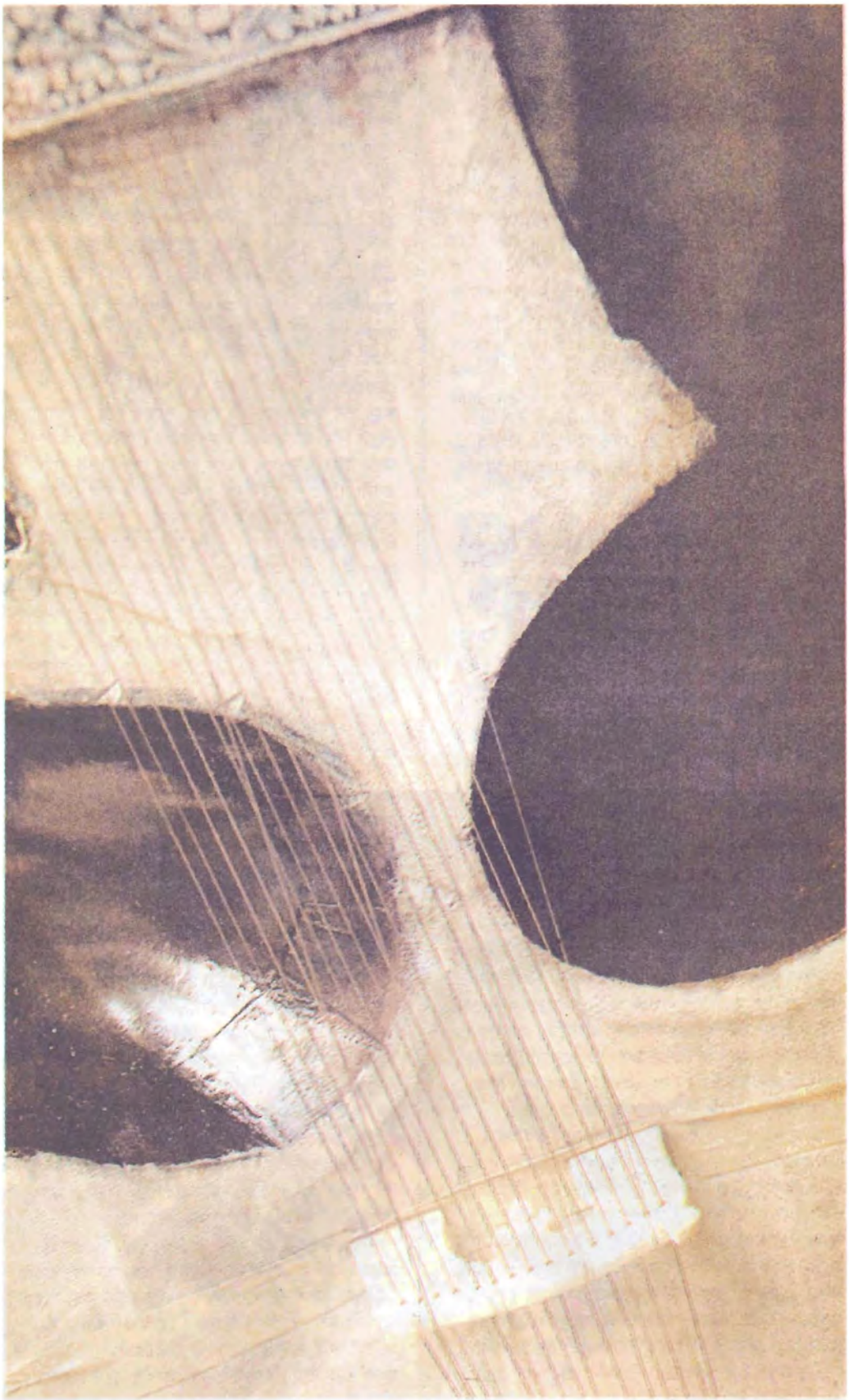

তা একদিন যশরাজ জানাল, আজ সন্ধ্যায় তার দাদা অর্থাৎ মণিরামজি কালীঘাটের মা কালীকে গান শোনাবেন, আমি চাইলে যেতে পারি। কালীঘাটের মন্দিরে লোকে পুজো দেয়, মানতরক্ষায় বলিও দেয়। কিন্তু মা কালীকে আসর বসিয়ে ক্লাসিকাল গান শোনানো বোধ করি সেই প্রথম। এবং সম্ভবত শেষও। পুরো আসরটার আয়োজন করা হয়েছিল বিগ্রহের সামনের নাট মন্দিরে। তাবৎ পুণ্যার্থীরা, পান্ডারা, মন্দিরের সঙ্গে সেঁটে থাকা যতরকম ব্যাপারী, পরগাছা—সবাই অবাক বিস্ময়ে দেখল—দেখল বলাই ভাল—নাটমন্দিরে বিশাল শতরঞ্চি, চাদর বিছিয়ে পণ্ডিত মণিরাম তদ্‌গতচিত্তে আড়ানা রাগে খেয়াল গানের মাধ্যমে কালী বন্দনা করছেন। বন্দিশটির শুরুতেই উত্তরাঙ্গপ্রধান চড়া রাগ আড়ানায় 'মাতা কালিকা' বলে হুঙ্কার এবং পণ্ডিতজির খটখটে গলায় প্রচণ্ড তানকর্তব। সবচেয়ে অবাক কাণ্ড—প্রায় ঘণ্টা দেড়েক ধরে এই ন ভূত ন ভবিষ্যতি কাণ্ডে সন্ধেবেলায় এলেবেলে লোকজনে ভর্তি মন্দিরে কেউ কোনও প্যাঁক দেয়নি বা অন্য কোনওভাবে আপত্তি বা বিরক্তি প্রকাশ করেনি। অবশ্য ঘটনাটা প্রায় ষাট বছর আগের কথা। তখন দেশের জনসংখ্যা কম ছিল, লোকের ধৈর্য, সহ্যশক্তি ঠুনকো ছিল না। এখন হলে কী হত, বলা মুশকিল।

কালীঘাটের মন্দিরের কাছেই অনেককাল ধরে কিছু গানবাজার বসার চল ছিল। রোজ নয়, তবে প্রায়ই। ক্রেতা, বিক্রেতা তথা শিল্পী, শ্রোতা কারুরই আভিজাত্যের তকমা ছিল না, তেমনই ছিল না শোনা আর শোনানোর আগ্রহে কোনও ঘাটতি। যেন শাপলার ফুল, রঙ-বাহারি ছটার বদলে ছড়ায় শান্ত স্নিগ্ধতা। মন্দির ছাড়িয়ে উত্তরমুখো কালীঘাট রোডে ক'টি দোকান—কোনওটির অনুদ্‌যাপিত শতবার্ষিকী পার হয়ে যেতে পারে—কলকাতা এবং মফস্বলের বিস্তীর্ণ এলাকার পুরুষানুক্রমিক তবলা সাপ্লায়ার। এমনই কোনও দোকান সন্ধ্যার পর পথচলতি লোকজনকে গানের সিন্নিভোগ খাওয়াত বিনা পয়সায়। এখনও সেই চলন বজায় আছে কিনা জানা নেই। এই দোকানগুলোতে তবলার বিক্রিও হত, মেরামতিও হত। সংলগ্ন গলিটি—যা দোকানগুলোর দৌলতে 'তবলা গলি' নামে খ্যাত ছিল—একটি অবিদ্যা পল্লির পুরনো আস্তানা।

সন্ধের দিকটায় ওই দোকানগুলোতে তাদের পৃষ্ঠপোষক নানান গাইয়ে বাজিয়ে আসতেন। গানবাজনার সঙ্গে তবলার ডালভাত সম্পর্ক। জল বিনে মছলি আর তবলা সঙ্গতহীন গান, দুইয়েরই এক হাল। সন্ধেবেলা নানান তবলা বাজিয়ে আর শিক্ষার্থীরা হাজিরা দিতেন এই ঠেকগুলোতে। একআধজন গুণী শিল্পীও হুটহাট চলে আসতেন কখনওসখনও। ফলে, সন্ধের পরে তবলাপাড়ায় গেলে বিনা আয়োজনে গানবাজনার ছোটখাটো আসর জমে উঠত ফুটপাথে থমকে যাওয়া শ্রোতাদের সামনে। তবলা গলির পসারিণীরাও খদ্দের ধরতে গলি থেকে রাজপথে উপচিয়ে আসত সে সময়টা। তখন আমার বয়েসী ছেলেদের জন্যে ওদিক মাড়ানোটা পুরোপুরি বারণ ছিল। তবু নিষেধ ভাঙার দুর্নিবার আকর্ষণে দু-চারবার চলে গিয়েছি। দেখেছি গেদো হালদার নামে কথিত—ইনি সম্ভবত মন্দিরের সেবাইত হালদার পরিবারসঞ্জাত—এক আশ্চর্য তবলাশিল্পীকে। নেশার মৌতাতে ওই দোকানগুলোর কোনও একটাতে বসে লহরার ফোয়ারা ছোটাতেন। সঙ্গে সঙ্গে মুখে বলে যেতেন তবলার বোল, অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে। আমার বয়েসী বালক-শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করার জন্যে মুখে

স্বকৃত ছড়া কেটে, সেই ছড়াকে তবলার মাধ্যমে উচ্চারিত করতেন। একটা ছড়া এখনও মনে আছে—

ধিন তেরেকেটে ধিন তাক
তোর মা রেঁধেছে পুঁই শাক,
আমি দিতে থাকি, তুই খেতে থাক।

এমনই এক ফুটপাথের আসরে সে-যুগের প্রখ্যাত সেতারিয়া লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যকে সেতার বাজাতে দেখি। তখন বয়েসই শুধু কম নয়, গানবাজনা সম্বন্ধে বোধবুদ্ধিতেও প্রায় প্রাকশৈশব স্টেজ-এ রাগ-রাগিণীর জ্ঞান না জন্মালেও সেতারের প্রতিটি টোকার মধ্যে জমাট মাখনের হাতুড়ি দিয়ে সুরের পেরেক ঠোকার আভাস পেয়েছিলাম। রেডিওতে সেতার শুনেছি, শুনেছি গ্রামোফোন রেকর্ডে। কিন্তু সেতারের এমন আওয়াজ তার আগে শুনিনি। আশপাশের লোকজন বলাবলি করছিল—আহা এমন প্রতিভা, কিন্তু সব খেল ওই নেশাতেই। শুনলাম, লক্ষ্মণবাবু নাকি নস্যিও খান, নাকে দেন না।

পরে জ্ঞানগম্যি আরেকটু হলে লক্ষ্মণবাবুর বাজনা রেডিওতেও শুনেছি। সুরে চোবানো জোরাল টোকা, কিন্তু বাজনায় কোন শৃঙ্খলা নেই। একটা স্ট্রোক করলেন তো পরের তিরিশ সেকেন্ড বুঁদ হয়ে রইলেন। ওঁর প্রতিভার নদী মরুপথে নয়, জলপথে হারা হয়েছিল। তাই কোন মেহফিলে বিশেষ ডাক পেতেন না তাঁর বাজনা এবং আচরণের নানান অসঙ্গতির জন্যে। অথচ সমঝদার গুণীজনরাও বলতেন—অসাধারণ প্রতিভাশালী বাজিয়ে, বাজনার একটা নতুন ধারার প্রবর্তক, কিন্তু নেশার স্রোতে নিজের জীবন যৌবন মানসম্মান সব ভাসিয়ে দিলেন। একটা অপচয়িত হতভাগ্য প্রতিভা বাজনা শিখেছিলেন তাঁর পূজারী ব্রাহ্মণ বাবার কাছে, তিনি কাঠ কুঁদে নিজের সেতার নিজেই বানাতেন। সেতারের গোল অংশে লাউয়ের তুম্বা ব্যবহার না করে সলিড কাঠকে কেটে কেটে ফাঁপা করে নিতেন। এই বাবার বানানো সেতারই বাজাতেন লক্ষ্মণবাবু। তাঁর সংগ্রহের বিপুল সম্ভার পেয়েছিলেন। কিন্তু কিছুই রাখতে পারেননি যত খাতাপত্র, তাঁর নানান শিষ্য হাতিয়ে নেয়। অভাব, দারিদ্রে নিপীড়িত তাঁর স্ত্রী ও পরিবার পরিজনকে দুর্দশাগ্রস্ত করে অকালে প্রয়াত হন জীবনের কক্ষচ্যুত এই শিল্পী। তাঁর চেহারাও বিশেষ মনে নেই, শুধু একজোড়া অস্বাভাবিক উজ্জ্বল চোখ ছাড়া।

শেষ পারানির কড়ি গান কণ্ঠে নয়, এখন নিয়েছি হৃদয়ে। জীবনে চাওয়ার যে কী ছিল, তাই বুঝতে বুঝতে বয়েস অনেকটা বেড়ে গেল। কিন্তু তবু 'কি পাইনি তার হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজি।' এখন মনে হয়—'ওরে বাতাস দিল দোল, ও তুই ঘাটের বাঁধন খোল।' মনটা জানা থেকে অল্প-জানা বা অজানাকে বেশি করে জানতে চায়। তাই হিন্দুস্থানি ধ্রুপদী সঙ্গীতকে বড় বেশি বিবর্তনহীন স্ট্যাটিক বলে মনে হয়। গাইয়ে, বাজিয়ে অনেক আছেন, কিন্তু কম্পোজার কোথায়? সে তো ভূ-ভারতে একজনই জন্মেছেন। রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথই। তাঁর প্রিয় রাগগুলোতে—বেহাগ, দেশ, ভৈরবী, খাম্বাজ, কেদারা, হাম্বির, ইমন, ইমনকল্যাণ, ভঁয়রো—ঈষৎ মোচড়ে কত না বৈচিত্র্য তথা ভ্যারিয়েশন সৃষ্টি করে দেখিয়েছেন—এভাবেও ভাবা যায়। কী অপরূপ মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন হাম্বির আর কেদারায় 'তিমির অবগুণ্ঠনে' গানটি সৃষ্টি করে। কিন্তু ঐতিহ্যবাদীদের প্রায় তালিবানি রক্ষণশীলতা ভারতীয় রাগভিত্তিক সঙ্গীতকে এক জগন্নাথের রথ বানিয়ে রেখেছে। নড়ে, কিন্তু শম্বুক গতিতে। তাই ঠুংরি, গজল শুনি, কিন্তু খেয়াল আর তেমন টানে না। সবই থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড় মনে হয়। কণ্ঠসঙ্গীতের চেয়ে বরং যন্ত্রসঙ্গীতে অনেক বেশি প্রাণ, গতিশীলতা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা আছে। আলাউদ্দিন খাঁ থেকে আলি আকবর খাঁ হয়ে আমজাদ আলির হাতে সরোদের টোনাল কোয়ালিটি, স্কোপ, রেঞ্জ খুব দ্রুত বদলে গিয়েছে, অবশ্যই আরও আকর্ষণীয় হয়েছে, এসেছে নতুন নান্দনিক সূক্ষ্মতা। সেতারেও বিলায়েত খাঁ, রবিশঙ্করের শিষ্য-প্রশিষ্যরা আগের থেকে অনেক বদলেছেন।

পুরনো চালের গানবাজনার মধ্যে আমার একটাই আকর্ষণ : পণ্ডিত রামনারায়ণের সারেঙ্গি। আমার মতো ইনসোমনিয়াকাতরের, অ্যালজোলাম ছাড়া ওষুধ বিটোফেনের ভায়োলিন কনচার্টো বা সেভেন্থ সিম্ফনি। কিংবা আমজাদের সরোদ, নিদেনপক্ষে রামনারায়ণের সারেঙ্গি।

সারেঙ্গি আমার লুকিয়ে রাখা এক মনের মানুষের মতো। ইন ফ্যাক্ট, বহু শতাব্দী ধরে অবিবর্তিত থেকে সঙ্গীতের মঞ্চ থেকে উত্তর ভারতের একান্তভাবে ট্র্যাডিশনাল এই অন্তরঙ্গ দেশি বাদ্যযন্ত্রটির ক্রমনিষ্ক্রমন বড় ট্র্যাজিক লাগে। যেন পরিবারের অঙ্গীভূত হয়ে যাওয়া দূর সম্পর্কের বৃদ্ধা মাসিমা বা পিসিমার অবহেলা অবজ্ঞায় একতলার এঁদো ঘরে একটু একটু করে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা মনে করিয়ে দেয়। হিন্দুস্থানি কণ্ঠসঙ্গীতের একদা অপরিহার্য যন্ত্র সারেঙ্গি বাইজিবাড়ির বাজনা-জ্ঞানে কেমন যেন ব্রাত্য হয়ে রইল। অথচ একইরকম সঙ্গতের যন্ত্র, তবলার বোলবোলাও বাড়তের দিকে। সঙ্গত বাদ দিলেও একক বাদক হিসেবে সেকালের খেরেক্কুরা-আল্লারাখা-আনোখিলাল থেকে শুরু করে হাল আমলের অনিন্দ্য চ্যাটার্জি, কুমার বোস, জাকির হোসেন—এমন ডজন এক ভাস্বর তবলিয়ার নাম করা যায়। তবলাবাদন শৈলীতেও দীর্ঘস্থায়ী ষাঁড়াষাঁড়ি বানের পালা চলছে এখনও। আনন্দের কথা, আহ্লাদের কথা।

কিন্তু সারেঙ্গি এই দাক্ষিণ্যের নেকনজর থেকে বঞ্চিত হল কেন? বুন্দু খাঁ, মহম্মদ সাগিরুদ্দিন, রামনারায়ণের সার্থক উত্তরসুরি এল না কীসের জন্যে? কেন এই বাজনাটি কোনও বাঙালিকে টানতে ব্যর্থ হল? অথচ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত তথা খেয়াল গানের গত শ'খানেক বছর ধরে বাঙালির কাছে এতটা গ্রহণীয় হওয়ার মূলে সবচেয়ে বড় অবদান একজন সারেঙ্গিবাজিয়ের। তিনি খালিফা বদল খাঁ সাহেব। শতায়ু এই প্রবাদপুরুষ 'লে লে বেটা দু রূপইয়া' বলে মুড়ি-মুড়কির মতো দুহাতে খেয়াল গানের বন্দিশ বিলি করেছেন উনবিংশ শতকের দীর্ঘকাল জুড়ে। আমির খাঁ সাহেবের সারেঙ্গিয়া বাবা শামির খাঁ।

সেই সারেঙ্গির ক্রমতিরোধানে এই ক্ষুদ্র এলিজি অথবা রিকুয়িম দিয়ে এ লেখার দাঁড়ি টানছি।

ছবি তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

জলসাঘর

নাম রেখেছি কোমলগান্ধার

খুব কাছ থেকে দেখা ভগবান।
সেতারের চতুর্থ তারে যাঁর
সুরসঞ্জীবনী অনুনাদ। এই নিখিল
বিশ্বে তাঁর রেশ আজও।
তেজেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

সালটা যতদূর মনে পড়ছে ৭৭ কি ৭৮, কলামন্দিরের সামনে তিলধারণের জায়গা নেই। অনুষ্ঠানের শিল্পী পণ্ডিত নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়—তবলায় উস্তাদ জাকির হোসেন। টিকিট শেষ—হাপিত্যেশ করে দাঁড়িয়ে আছি যদি কেউ দয়া করে একটা অতিরিক্ত টিকিট বিক্রি করেন বা উদ্যোক্তাদের কোনওরকমে বশ ক'রে যদি একটু ভেতরে ঢোকা যায়। তখন পকেটে পয়সাও নেই যে, বেশি পয়সা দিয়ে কেউ টিকিট বিক্রি করলে কিনতে পারব—যাই হোক, কেউ সদয় হলেন না। বিফল মনোরথ হয়েই ফিরতে হ'ল। পরে অবশ্য সেই অনবদ্য 'মনোমঞ্জরী' শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল, ক্যাসেটবন্দি অবস্থায় যখন আমার হাতে পৌঁছয় তখন। আমাদের ছোটবেলায় যে-ক'জন শিল্পী সম্বন্ধে মনে হত, এঁরা সত্যিই ভগবানের খুব কাছের মানুষ—তাঁদের মধ্যে একজন পণ্ডিত নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমার গুরুদেব (উস্তাদ বাহাদুর খাঁ সাহেব এবং উস্তাদ আলি আকবর খাঁ সাহেব) ছাড়া যাঁকে আমি গুরু হিসাবে চিরকাল মেনেছি তিনি হলেন নিখিলবাবু। ওনার কথা বলতে গেলেই কীরকম মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। পণ্ডিত রবিশঙ্কর ও উস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ সাহেবের মতো দুই কিংবদন্তী সেতারবাদক যখন মধ্য গগনে, সেই সময় এইভাবে একজন সেতারিয়া নিজের বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ হয়ে যেভাবে শ্রোতাদের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন, তা অভাবনীয়।

পণ্ডিত নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে সাধারণভাবে যেটা শোনা যায় তা হ'ল, অত্যন্ত সিরিয়াস একজন শিল্পী—গভীর জীবনবোধসম্পন্ন, আপসহীন এক শিল্পী। আমার ক্ষুদ্র সাঙ্গীতিক জীবনে একজন শিক্ষার্থী হিসাবে ওনাকে বা ওনার বাদনবৈশিষ্ট্যকে যেভাবে বোঝার চেষ্টা করেছি—তারই একটা ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা এই প্রতিবেদন।

কলকাতার এক সাঙ্গীতিক পরিবেশে তাঁর জন্ম। প্রাথমিক শিক্ষা তাঁর বাবা জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। তারপর সব মহীরূহসমান গুরুদের সান্নিধ্য—জন গোমেস, বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, পণ্ডিত রাধিকামোহন মৈত্র, উস্তাদ মুস্তাক আলি খাঁ। এরপরই ঘটে সেই যোগাযোগ—উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব। তিনি ওঁকে শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করেন এবং সর্বোপরি, উস্তাদ আলি আকবর খাঁ সাহেব তাঁকে অকৃপণ হস্তে শিক্ষাদান করেন। একটা সময় ছিল যখন নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে একটা প্রভাব ছিল মাইহার ঘরানার আর এক স্তম্ভ, পণ্ডিত রবিশঙ্করের। কিন্তু, ওনারই এক সাক্ষাৎকারে উনি বলেছেন—সঙ্গীতদর্শনে এক পরিবর্তন এল যখন উস্তাদ আমির খাঁ সাহেবের সান্নিধ্য পেলেন। ওনার ভগ্নী শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায় উস্তাদ আমির খাঁ সাহেবের শিষ্যা ছিলেন। খাঁ সাহেবের গায়কীর এক অভাবনীয় প্রভাব পড়ল তাঁর বাজনায়—আর তাঁর সঙ্গে উস্তাদ আলি আকবর খাঁ সাহেবের তালিম ও সান্নিধ্য। আমার কাছে মনে হয়, একজন শিল্পী কালোত্তীর্ণ বা যুগোত্তীর্ণ হ'ন তখনই যখন তিনি যে কোনওরকম বাঁধনমুক্ত হয়ে তাঁর শিল্প সৃষ্টি দিয়ে এক নতুন দিশা দেখান। ঘরানার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধ হয়েও তাঁর নিজস্ব মনন ও চিন্তনে তৈরি করেছিলেন অনবদ্য এক বাদন শৈলী—যা এখন পরিলক্ষিত হয় প্রত্যেক উঠতি সেতার

বাদকদের বাদনে—কিন্তু অনতিক্রম্য এক শৈলী—প্রভাবান্বিত সকলেই। তাই, মৃত্যুর ২১ বছর পরেও দেখি ইউরোপে তাঁর ক্রমবর্ধমান পপুলারিটি। এই প্রসঙ্গে বলি, আমির খাঁ সাহেবের গায়ন শৈলীর যে যন্ত্রানুবাদ করেছেন, তার জন্য উনি সংযোজনা করেন—চার নম্বর তার মূল তার হিসাবে ব্যবহার করা। সেই কারণেই, ওনার কন্টিন্যুইটি-র যে লিমিটেশন, তাকে অতিক্রম করে আওয়াজের সাস্টেনেন্স বাড়িয়ে এক দুর্লভ টোন তৈরি করেছিলেন তিনি। বাদনে এক অবিচ্ছিন্ন সুরময়তা রাগ পরিবেশনের ক্ষেত্রেও মনে হয়। যে কল্পনার নির্যাসে এক একটি রাগকে পরিবেশন করেছেন—তা অকল্পনীয়। ওনার কাছে শুনেছি—সরোদে উস্তাদ আলি আকবর খাঁ সাহেব ও সেতারে উস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ সম্পর্কে তাঁর কী গভীর শ্রদ্ধা—বলতেন আগামী কয়েকশো বছরেও এইরকম মিউজিশিয়ান জন্মাবেন না। আর বলতেন, সেতার যন্ত্রের টেকনিক বুঝতে গেলে উস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ সাহেবকে বোঝা দরকার। আজকের প্রজন্মের যারা প্রথম সারির শিল্পী, যাঁদের ভারচুওসিটি (কলাকুশলতা) নিয়ে ভূয়সী প্রশংসা করা হয়—তাঁদেরও ভাবতে হয়—পণ্ডিত নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এমন এক শিল্পী, যিনি এস্থেটিক্স ও ভারচুওসিটির এক অনবদ্য মিশেল। তিনি যে 'তৈয়ার' দেখিয়েছেন—নিজে একজন যন্ত্রী হিসাবে বলতে পারি যে—অত তৈরির মধ্যেও রাগের শুদ্ধতা ও সুরময়তার সম্পৃক্তি—এক অতি ঈর্ষণীয় উদাহরণ। মেরুখণ্ড তানের ব্যবহার যে কোনও শ্রোতাকে মনে করায় যে, কত রেওয়াজি ছিলেন তিনি। স্বল্পভাষী, রেওয়াজ-আপসহীন অনুষ্ঠান করার সংখ্যার দিকেও তিনি ছিলেন সংযমী। আর ছিল তাঁর প্রতিমুহূর্তে আরও ভাল কিছু শোনানোর ইচ্ছা। তাই শেষ দিন পর্যন্ত প্রত্যহ চার-পাঁচ ঘণ্টার রেওয়াজ ছিল বাধা।

আমার আর এক ঘনিষ্ঠ দাদা, পণ্ডিত অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়, যিনি ১৯ বছর ধরে পণ্ডিত নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গত করেছেন—তাঁর জবানিতে উনি বলেন, 'কাকাবাবু ছিলেন আমার আর এক গুরু, কত কিছু যে শিখেছি ওনার কাছে! একবার আমি ওঁর সঙ্গে তবলা সঙ্গত করার সময় একটু বেশি বাজিয়ে ফেলেছিলাম, তখন আমিও কমবয়সী ছিলাম, পরে উনি আমায় বললেন, এই বিদ্যাপ্রদর্শনে কিছু জাহির করতে চেয়ো না। মনে করো, তুমি উপরওয়ালার জন্য কিছু নিবেদন করছ, তাহলেই আরও দেবেন তোমায় উনি।'

নম্রভাষী, রসবোধসম্পন্ন মানুষটি খুব খাদ্যরসিক ছিলেন। কেউ যদি জিগ্যেস করতেন—এই জায়গাটা কীভাবে রেওয়াজ করব? বলতেন 'মাংসের হাড্ডি খাও—তাহলেই চার-পাঁচ পর্দার মীড় টানতে পারবে।' খুব খবর রাখতেন, উঠতি শিল্পীদের খবর। রোজ সকাল সাড়ে আটটা বাজলেই আকাশবাণীর উচ্চাঙ্গ সংগীতের অনুষ্ঠান শুনতেন। অনিন্দ্যদার জবানিতে—'একবার আমায় বললেন, 'সালটা ৮২ সাল—একজনের সরোদ শুনলাম—খুব ভাল লাগল—জান এই ছেলেটাকে—নাম তেজেন্দ্র! আমি বললাম—হ্যাঁ, বাহাদুর খাঁ সাহেবের ছাত্র—বললেন—এই ছেলেটি অনেকদূরের ঘোড়া—ভবিষ্যতে ভাল বাজাবে।' আমার কাছে এটিই

সব থেকে বড় পুরস্কার। আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, কতটুকু গানবাজনা করতে পারি জানি না—কিন্তু এই জীবনে উস্তাদ আলি আকবর খাঁ, পণ্ডিত নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় পণ্ডিত রবিশঙ্কর, উস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ, উস্তাদ হেমললিত বাহাদুর খাঁ সাহেব, তাঁদের শ্রেষ্ঠ বাজনা শুনতে পেরেছি—এই জন্যই আমার জীবন সার্থক। কে ভুলতে পারে ওনার বিলাসখানি, শ্যামকল্যাণ, শুদ্ধকল্যাণ, পটদীপ, মালকোষ, মেঘ, হেমবেহাগ, শুদ্ধবসন্ত, হেমন্ত—তালিকা শেষ হওয়ার নয়।

১৯৮৬ সালের ২৫ জানুয়ারি, ডোভার লেন সঙ্গীত সম্মেলনের আসর, মধ্যরাতের প্রধান শিল্পী পণ্ডিত নিখিল বন্দ্যোপাধ্যার—সঙ্গে পণ্ডিত স্বপন চৌধুরী। ২৫ টাকার টিকিট-এর (তার বেশি দামের টিকিট কাটার সঙ্গতি ছিল না) চেয়ারে বসে আমিও। প্রথম দর্শনে একটু কষ্ট হল। যে সদাপ্রশস্তি মুখে থাকে, তা হয়তো আছে কিন্তু সঙ্গে রয়েছে অজানা এক ক্লান্তি। শুরু হল 'দরবারি কানাড়া'—অসাধারণ কোমলগান্ধারের আবেদন, কোমল নিষাদ ছুঁয়ে কোমল ধৈবতের আন্দোলন—স্বর্গীয় অনুভূতি। কিন্তু, কে জানত, সেই কোমলগান্ধারই বিধাতার লিখনে হবে শেষ কোমলগান্ধার। ২৭ জানুয়ারি চলে গেলেন তিনি মাত্র ৫৫ বছর বয়সে। রেখে গেলেন অগণিত ভক্ত, শ্রোতা আর আমার মতো শিক্ষার্থীদের। রেখে গেলেন এক অনবদ্য শৈলীকে যা, আমার মনে হয়, যন্ত্র ও কণ্ঠকে ছাপিয়ে তৃতীয় এক অনুভূতি সৃষ্টি করত।

আমার জীবন ধন্য হবে যদি ওঁর আদর্শের এক কণাও আমার সঙ্গীতের মধ্যে সঞ্চয় করতে পারি।

ছবি : তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

গোঁ
গোঁসাই
বাগান

জয় গোস্বামী

সেই একেবারে শুরুর বয়সে, লেখাপত্র নিয়ে যখন প্রথম নাড়াচাড়া করছি, তখন একটা কথা শুনতাম, যা এখন, এই পঞ্চাশ বছর বয়স পার করেও শুনি। তা হল, আধুনিক কবিতা দুর্বোধ্য, তা নাকি, বোঝা যায় না ঠিক মতো পিছন দিকে তাকালে দেখব, এই অভিযোগ অনেক পুরনো। সোনার তরী লিখেও রবীন্দ্রনাথকে শুনতে হয়েছিল, এর অর্থ কী? কবিতার বোধ্য-দুর্বোধ্য ব্যাপারটা নিয়ে তখনও কথা হয়েছিল। এমনকী খানিকটা রাগারাগিও হয়েছিল বটে। কথাটা রবীন্দ্রনাথ ও সোনার তরী বলে অনেক সহজে আজ আমরা এটা সরিয়ে রাখতে পারি মীমাংসা তো সময়ের কাছে হয়েই গিয়েছে ধ'রে নিয়ে। কিন্তু তখনই ভাবনা হয় যখন দেখি, বিশেষ একজন কবিকে সময় তার হৃদয়ে গ্রহণ করে নিল হয়তো, তিনি তাঁর জীবৎকাল পার হয়ে এলেনও, কিন্তু পরবর্তী যে-কবিতা লেখা হয়ে চলেছে, তার সম্পর্কেও একই অভিযোগ জারি থেকে যাচ্ছে বছরের পর বছর। একই অভিযোগ কী ক'রে চলমান থেকে যায় লোক পাল্টে পাল্টে?

তারমানে পাঠকের হৃদয় সত্যিই কোনও কোনও কুয়াশার মুখোমুখি দাঁড়ায় নিশ্চয়, কবিতা পড়তে গিয়ে? কোথাও কোথাও তার মস্ত ধাঁধা লাগে? এ বিষয়ে কবিদের মত কেমন হতে পারে? দুই ভিন্ন যুগের দুই ভিন্ন প্রকৃতির কবির উদাহরণ দিই যদি! যে-দুর্বোধ্যতার জন্ম পাঠকের আলস্যে তাকে আমল দিতে চাননি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। আর নিজের কবিতার বই উৎসর্গ করেছিলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায় 'আধুনিক কবিতার দুর্বোধ্য পাঠকের হাতে।' এই দুটি উদাহরণই আমাদের সবার খুব চেনাজানা। তবে এই দুটি ক্ষেত্রেই আছে এক ধরনের প্রত্যাখ্যান। অন্তত আংশিক প্রত্যাখ্যান। যে-প্রত্যাখ্যানের সূচনা অভিমান থেকে। সে-অভিমান হল এই যে, আমি যে আমার সারাজীবনটা ঢেলে দিচ্ছি কবিতায়, ঢেলে দিচ্ছি আমার সব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, পড়বার আগে তুমি কেন আরেকটু প্রস্তুত হয়ে আসবে না? আমি আমার পক্ষে প্রয়োজনীয় যে শব্দ ব্যবহার করব, বা যে রেফারেন্স—তা কেন জানা থাকবে না তোমারও? যদি জানা না-থাকে তাহলে কেন তুমি দোষ দেবে আমাকে? আর পাঠক বলবে, তুমি কবি, তুমি কেন আমার হৃদয়কে জিতে নেবে না? তুমি কবি, আমাকে সম্পূর্ণভাবে কেড়ে নেবে তুমি, অযথা, অর্ধেক আহত করে চলে যাবে কেন? এইভাবে দুয়ের মধ্যে ফাটল তৈরি হয়। দুজনে দুদিকে সরে যান। মধ্যে পড়ে থাকে একাকীত্ব কবিও একাকী হয়ে পড়েন। পাঠকও।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যখন লেখেন, 'সে-পাড়া জুড়োনো বুলবুলি নও তুমি/বর্গীর ধান খায় যে উনতিরিশে'—তখন ১৯২৯ সালে বিশ্বব্যাপী যে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছিল তাঁরই উল্লেখ রাখেন কবিতায়। অথবা, ধরা যাক আরও একটি খুব জানাশোনা উদাহরণ যা আছে তাঁরই বন্ধু বিষ্ণু দে'র কবিতায়; 'শ্রাবণসন্ধ্যার সেই মাতিস আকাশ।' আকাশের আগে মাতিস কথাটা দেখে নিশ্চয়ই প্রথম পড়ার সময় ধাক্কা লাগতে পারে নতুন পাঠকের। কিন্তু একটু খুঁজলে তিনিও জেনে যাবেন যে-চিত্রকর মাতিস-এর উল্লেখ রয়েছে এখানে, তাঁর ছবির রং-এর বর্ণ নিয়েছে শ্রাবণসন্ধ্যার আকাশ। বিশেষ ধরনের একটি সন্ধ্যারং বোঝাতে গিয়ে মাতিস-এর সাহায্য নিলেন বিষ্ণু দে। আর পাঠক যেই মাতিস-এর ছবির কথা জানতে পেরে যায় তার কাছে আর দুর্বোধ্য থাকে না ওই আকাশ। বা, এই বিষ্ণু দে-ই যখন লেখেন 'কোয়ার্টেট যেন কোনও অতন্দ্রিত/অপরাজেয় গ্রোস ফুগের গান' তখন প্রথমটা অসুবিধা হয় ঠিকই। কিন্তু যখন জানা যায় কোয়ার্টেট এবং গ্রোস ফুগো পাশ্চাত্য সঙ্গীতের দুটি বিশেষ ফর্ম, অর্কেস্ট্রায় এবং বৃন্দগান-এ এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, তখন তা আর দুর্বোধ্য থাকে না বরং সাতমাত্রার ছন্দে এই শব্দদুটি প্রযুক্ত হয়ে কেমন আশ্চর্য সামর্থ্য এনেছে কবিতায় তা জেনে আমরা মুগ্ধ হই।

অবশ্য এসব কিছু নতুন কথা নয়। সুধীন দত্ত, বিষ্ণু দে'র কবিতা নিয়ে এমন আলাপ আলোচনার বয়সও আজ পঞ্চাশ পেরোলো। যদি অচেনা বা অপ্রচলিত শব্দ থাকে কবিতায়, বা না-জানা কোনও রেফারেন্স, তাহলে সেই শব্দের অর্থ বা রেফারেন্স-এর সূত্রটি জানতে পারলেই কবিতাটির সাময়িক দুর্বোধ্যতা কেটে যায় কিন্তু আর এক ধরনের কবিতা আছে, যাকে ভেদ করা এত সহজসাধ্য নয়।

যেমন...'পচা ধানের গন্ধ, শ্যাওলার গন্ধ, ডুবো জলে তেচোকো মাছের আঁশগন্ধ সব আমার অন্ধকার অনুভবের ঘরে সারি-সারি তোর উনুনের নুন-মশলার পাত্র হল, মা। আমি যখন অনঙ্গ অন্ধকারের হাত দেখি না, পা দেখি না, তখন তোর জরায় ভর করে এ আমায় কোথায় নিয়ে এলি। আমি কখনও অনঙ্গ অন্ধকারের হাত দেখি না, পা দেখি না।

কোমল বাতাস এলে ভাবি, কাছেই সমুদ্র। তুই তোর জরার হাতে কঠিন বাঁধন দিস। অর্থ হয়, আমার যা কিছু আছে তার অন্ধকার নিয়ে নাইতে নামলে সমুদ্র সরে যাবে শীতল সরে যাবে মৃত্যু সরে যাবে

হ্যাঁ, শক্তি চট্টোপাধ্যায় এঁর আরও একটি কবিতাখণ্ড নিয়ে দেখা যাক

...পুরোনো গলির মধ্যে মজ্জমান মাতালের হাসি
আত্মীয় বর্জিত নাকড়া চোরা ছায়া কিংবা পাতকুয়ো
সাহসী বর্ষার তৈরি চটচটা জানালাতে ঝুল
মনে পড়ে মাকে কিংবা বাবাকে বকুল-
তলার কোন মাটি মাটি পাখিকে হারিয়ে
মা বাবা দুজনে গেছে কোন ভোরে হাটে
নেচে নেচে দুঃখ আসে তার সঙ্গে বিয়ে
জন্মের অনেক আগে ভালো বাটনা বাটে
বিচিত্র রঙের মশলা কুটনো রাশি রাশি
ব্যঞ্জনে লবণ দেয় খণ্ড খণ্ড বিদ্রূপের হাসি
সে এক মৃত্যুর হাত কানাকনসি বাজিয়ে বেড়ায়
গৃহস্থের ভাঙা দোরে ঘুরঘুরে পোকার মতো আসি
তরুণী বধূর গর্ভে, হাতে দিগ্বিজয়ী রেখাপাত...

এই যে লাইনগুলো আসছে, এর মধ্যে কোনও পরম্পরা

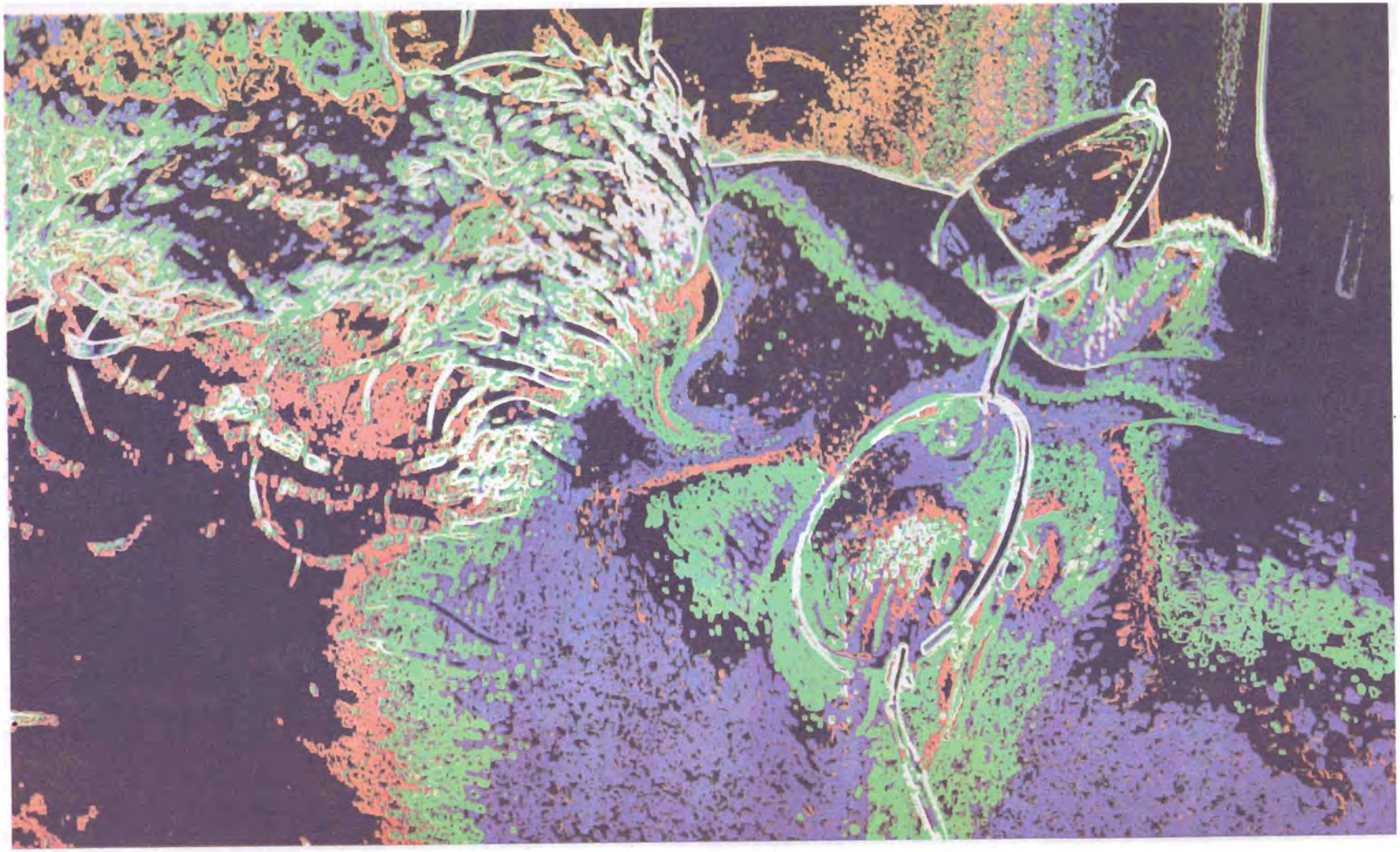

ধরা যায় না যেন। আগের লেখাটি হল, শক্তির বিখ্যাত জরাসন্ধ, কিন্তু এ লেখাটি তেমন পরিচিত নয়। স্রোতের মতো এসে পড়ছে কবিতার শব্দ চিত্র উপমাগুলো। যেন প্রত্যেকটিই আকস্মিক। প্রথম লেখাটিতে যে রয়েছে পচা ধানের গন্ধ, শ্যাওলার গন্ধ বা ডুবো জলে তেচোকো মাছের আঁশগন্ধ যারা মা'র ভাড়ার ঘরে রাখা সারি সারি নুনমশলার পাত্রে রূপান্তরিত হল, অথবা, অথবা রয়েছে যে আমার যা কিছু আছে তার অন্ধকার নিয়ে নাইতে নামলে সমুদ্র সরে যাবে শীতল সরে যাবে মৃত্যু সরে যাবে—এইসব লাইনে বিশেষ কোনও শব্দের অর্থ জানতে পারলে, বা কোনও রেফারেন্স-এর উল্লেখ বুঝতে পারলে কবিতাটি ধরা দেবে সে সুযোগ নেই। কারণ তেমন কোনও শব্দ অথবা রেফারেন্স ব্যবহার করা হচ্ছে না এখানে। এখানে তৈরি হচ্ছে একটি আবহাওয়া। এই পুরো আবহাওয়াটাই রহস্যমণ্ডিত কুয়াশাচ্ছন্ন। এই রহস্যকুয়াশার মধ্যেই কবিতাটির অস্থা রচিত হয়েছে। 'জন্মের অনেক আগে ভাল বাটনা বাটে' অথবা 'সে এক মৃত্যুর হাত কানা কলসী বাজিয়ে বেড়ায়' ব'লে ক'য়ে এর কী অর্থ করবেন আপনি? আবার সে এক মৃত্যুর হাত লাইনটিতে অব্যর্থভাবে শক্তির চরিত্র লক্ষণ উপস্থিত। যেমন এর পরেই গৃহস্থের ভাঙা দোরে ঘুরঘুরে পোকার মতো আসি/তরুণী বধূর গর্ভে, হাতে দিগ্বিজয়ী রেখাপাত', এখানে একদিকে যদি শক্তির সেই অবধারিত শরক্ষেপ অন্যদিকে তরুণী বধূর গর্ভে লাইনটিতে অমোঘ সৌন্দর্যের রচনা।

এসব ক্ষেত্রে স্পষ্ট একলক্ষ্য কোনও অর্থভেদ করার আশা ভুল। পুরো আবহটিই কবি ঢেলে দিচ্ছেন নিজেকে উজাড় করে, পুরো আবহটিকেই পান করতে হবে পাঠককে।

পাঠক যদি এমন কবিতার সামনে পড়ে তার অর্থ ভেবে প্রাথমিকভাবে অসহায় বোধ করেন তাহলে বলতেই হবে এক্ষেত্রে কবিও কিন্তু অসহায়। কেন না কবিতার মধ্যে যে রহস্যআবহ তৈরি হয়, সেই রহস্য আসলে তাঁর চেতনার মধ্যগত রহস্য। তাকে অবিকল ভাষায় ঢেলে না-দিয়ে তাঁর উপায় ছিল না। শক্তি ছিলেন সেই শ্রেণির কবি, তীব্র প্রেরণা দ্বারা এক ধরনের আচ্ছন্ন অবস্থায় পৌঁছতেন কবিতা রচনাকালে। অন্তত তাঁর প্রথম যুগের অজস্র কবিতায় তার চিহ্ন পাওয়া যায়। আমি প্রথম দিকের দুটি রচনার আশ্রয় নিয়েছি এখানে। যখন কবি ঢেলে দিতে থাকেন তার চেতনার ধারাকে অনেক সময়, রচনাকালেও, তাকে কোনওভাবে বাধা দেওয়া বা সংশোধন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ তিনি যে সেই স্রোতটির দ্বারা গ্রস্ত, তাড়িত, নিরুপায়। হয়তো এজন্যই একবার তিনি লিখেছিলেন এই ধরনের একটা কথা, যে কবিতায় পরিমার্জনা তিনি পারতপক্ষে স্বীকার করতে চান না। বরং চিত্র ও সঙ্গীতময় পংক্তি যেমনভাবে আসে সেইভাবেই তাদের কাগজের ওপর বসিয়ে নিশ্চিন্ত।

এ অবস্থা কেন হয়? অনুমান করি, কবিতা রচনা কালে অনেক সময় কোনও কোনও কবি একটি বিশেষ নিবিষ্ট অবস্থায় পৌঁছে যান। ফলে, তখন, অবচেতনার জাগরণ হয়।

একজন কবি কবিতা লেখেন প্রধাণত তাঁর জীবনযাপন থেকে। এই জীবন কেবল ব্যক্তিগত জীবন নয়, চারপাশের সমাজ সংসার ঘটনা দুর্ঘটনা কেবলই মিলে মিশে তাঁর অভিজ্ঞতা গঠন করে চলেছে, যেভাবে ভূত্বক গঠিত হয়, সেইভাবে। এই জীবনকে ধরতে পারি ২৪ ঘন্টার যাপিত সময়টি দিয়ে ভাগ ক'রে। একটির পর একটি ২৪ ঘন্টার দিন যুক্ত হয়েই তো তৈরি হয় জীবন। এই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অন্তত ১৭/১৮ ঘণ্টা আমরা প্রত্যেকেই সচেতনভাবে নানা কাজকর্ম করি। অফিস যাওয়া, মানুষের সঙ্গে মেলামেশা। বইপড়া, নারী বা পুরুষের নারী বা পুরুষ সংসর্গ, আরও বহুবিধ দরকারী অদরকারী ক্রিয়া আমরা সম্পন্ন করি সচেতন অবস্থায় থেকে। রাতে, ঘুমোতে যাই। ঘুমোলে স্বপ্ন দেখি। সেই স্বপ্নে কিন্তু নানারকম আশ্চর্য ও উদ্ভট জিনিস ঘটতে দেখি প্রতিদিনই। সকালে উঠে তাদের মনে করতে পারি না অনেকসময়, কিন্তু অভিজ্ঞতাটি আমাদের চেতনার মধ্যে কোথাও থেকেই যায়। স্বপ্নের মধ্যে উদ্ভট অসম্ভব যে ক্রিয়াগুলো ঘটতে দেখি তার কোনও বাইরের থেকে পাওয়া স্পষ্ট যুক্তি নেই। উল্টোদিকে, সচেতন অবস্থায়, ১৭/১৮ ঘণ্টার জাগ্রত সময়টিতে যা যা করি যুক্তিতে তার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। স্বপ্নের ভেতরকার কাজগুলির কোনও যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা আমরা সাধারণভাবে বেশিরভাগ সময়ই পাই না। অর্থাৎ, আমরা চাই বা না-চাই, ২৪ ঘণ্টার একটা অংশ আমরা গভীর অবচেতনের সঙ্গে কথা বলে কাটাই। অবচেতনার সঙ্গ পাই, প্রত্যেকদিন, কিছু সময়ের জন্য হলেও। সেটি আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে থেকেও যায়।

এইবার, কবি যখন কবিতা লেখেন তখন তো জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে তিনি তার পুরো অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারটি ব্যবহার করেন। ব্যবহার করেন বললে, যেমন একটা সচেতন প্রয়োগের কথা ধারণায় আসে ব্যাপারটা সবসময় ঠিক সেরকম হয় না। রচনাকালে অনেকক্ষেত্রে তেমন সচেতনতার বদলে একটি অতি-নিবিষ্টতার মধ্যে তিনি চলে যেতে পারেন। তখন স্বপ্নের স্রোতের মতো অবচেতন জেগে ওঠে কোথাও কোথাও। বিশেষভাবে শক্তির সম্পর্কে একথা আরও সত্য কারণ সেই তথ্যটি সকলেরই জানা, যে মদ্য তাঁকে পদ্যের কাছে দ্রুত নিয়ে যেতে পারত। নেশা দ্বারা একটি আচ্ছন্নতার অভিজ্ঞতা শক্তি নিয়মিতই গ্রহণ করতেন। প্রথম জীবনে, তাঁর কবিতায় তাই দেখা দিয়েছিল অবচেতনার শক্তিশালী উদ্ভাসন।

স্বপ্নের একটা সুবিধে হল, স্বপ্নের দ্বিতীয় দর্শক নেই। আমার স্বপ্ন আমিই দেখব। মানে বোঝানোর দায় নেই। কবিতার দ্বিতীয় দর্শক আছে। পাঠক। যে কিছু বিমূঢ় বোধ করতে পারে স্বপ্নচালিত রচনার সামনে দাঁড়িয়ে। তারপর সে বোঝে, কবি তাঁর সমস্ত চেতনাকে উজাড় করে দিয়েছেন। আমিই কি আমার নিজের মন সম্পূর্ণ জানি? জানলে, স্বপ্ন দেখে ভোরে ঘুম ভাঙলে এত অবাক হই কেন? আমিও তো আমার চেতনাকে জানি না পুরোটা। আর কবি, বিশেষত শক্তির মতো কোনও কোনও কবি, কেবল নিজের সচেতন অংশটুকুই নয়, চেতনার না-জানা অংশটুকুও মুক্ত করে দেন নিজের কবিতায়। তখন তাকে কি দুর্বোধ্য বলে উপেক্ষা করতে পারি?

পথের পাঁচালি

লোকসংস্কৃতি ধরে রাখে মানুষের সঙ্গে পরিবেশ, পারিপার্শ্বিক সম্পর্কের জলছাপ। নাগা গল্পে গাইরেমনঞ আবিষ্কার করে তার প্রকৃত ভাইবোনদের। আর আমরাও তাদের হাত ধরি, আরেকবার।
জয়া মিত্র

এই আমাদের পৃথিবী-মা, সমস্ত জীবিত প্রাণীর, সমস্ত আগামী প্রাণীর যিনি একমাত্র ধাত্রী, তাকে নিয়ে অনেক গল্প বুনেছে মানুষ। লিখে রাখা, ছেপে ফেলা গল্পের চেয়ে আরও অনেক অনেক বেশি বয়স মুখে মুখে চলে আসা গল্পের। লেখা-গল্প কেবল একজন মানুষের ভাবনা ধরে রাখে কিন্তু বলা-গল্প যেন বয়ে আসা স্রোতের মতো, যে বলছে তার মুখ থেকে, তার মন থেকে, তার সৌন্দর্যনির্মাণ থেকে একই গল্প নতুন নতুন করে জন্মাচ্ছে। নতুন কথক ভেদে পুনর্নির্মাণ বারবার। সেইসব প্রাচীন গল্পে যখন মানুষের সঙ্গে অন্যান্য প্রাণের সম্পর্ক-অসম্পর্কের কথা থাকে, সে বড় সুন্দর। না জানি কত বছর ধরে পাহাড়ের ওপর থেকে নেমে আসা বিরাট ঝর্নাধারার মতো সুন্দর, রহস্যময়।

ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের মানুষরা প্রায়শই, সমস্ত পশ্চিমী শিক্ষা ও অভ্যাসের বহুল প্রচলনের পরও, নিজের সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকেন। সেইখানে তাঁদের অস্তিত্বের শিকড় বেশ গভীরে ছড়ানো। উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্যতম প্রাচীন জাতি নাগাদের মধ্যে প্রচলিত একটি গল্পের কথা বলি। মানুষের সঙ্গে তার পৃথিবীর, তার প্রতিবেশের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের কথা আজ আমাদের পরিবেশবিদ্যা ক্লাসে কষ্ট করে বোঝাতে হয়, অথচ কী সহজ সৌন্দর্যে এ ধরনের গল্পে বলা হয়েছে। সব প্রাচীন সভ্যতায়, সব প্রাচীন ভাষায়, এরকম গল্প নিশ্চয় আছে, যাতে মানুষের সঙ্গে পৃথিবীর অন্য অন্য প্রাণী-অপ্রাণীর নিকট আত্মীয়তার সম্বন্ধ বিবৃত আছে। তার কথাবস্তুর আক্ষরিক অর্থকে ছাপিয়ে মানুষদের কাছে ধরা দেয় এইসব গল্পের অন্তর্বস্তু, অন্তরস্থ বার্তাটি যে, এই পৃথিবীতে একা নয় মানুষ। পৃথিবীও নয় কেবল মানুষেরই। ধরণীর পাহাড় জঙ্গল পশুপাখি জল বাতাস সব কিছুই সংলগ্ন একে অন্যের সঙ্গে।

প্রথম গল্পটি গাইরেমনঞকে নিয়ে। সে হল রংমেই গোষ্ঠী নাগাদের লোককথার নায়ক। প্রায় দেবতার মতোই তার মান্য। একটি পাহাড় এখন তার নামরূপ। কেমনভাবে জন্ম হয়েছিল তার? তার মা ছিলেন অপরূপ রূপসী এক মেয়ে। তার রূপ, তার আনন্দে যেন সারা পৃথিবী আনন্দময় সুন্দর হয়ে থাকত। সেই মেয়েটিকে দেখে দেখে মুগ্ধ হলেন আকাশ পৃথিবীর প্রধান দেবতা। তার মিলনকামনা করলেন তিনি। কিন্তু তিনি দেবতা, তাঁর তো নির্দিষ্ট কোনও রূপ নেই। আর অরূপে, অ-শরীরে মিলন সম্পূর্ণ হবে না যে। দেবতা তখন ধরলেন প্রকাণ্ড এক অজগর সাপের রূপ। বিশ্বদেবতার সঙ্গে মানুষের, মেয়ের সেই মিলনে জন্মাল যে শিশু, বড় হতে হতে সে দেখল তার মায়ের দুঃখ। দেখল দুঃখে, অন্যায়ে ভরে যাচ্ছে সারা পৃথিবী।

সে তখন বেরল এই দুঃখের মূল খুঁজতে। কে করছে এত অন্যায়? কার স্বেচ্ছাচারিতায় দুঃখে ভরে যাচ্ছে প্রাণীদের জীবন? তার মা ম্লান হয়ে আছে যে দুঃখের তাপে! বহু বাধা এল তার খোঁজার পথে কিন্তু মায়ের শক্তিতে, মায়ের আশীর্বাদে সেই মাটির মেয়ের সন্তান

শেষ পর্যন্ত চিহ্নিত করতে পারল সেই স্বেচ্ছাচারী অন্যায়কারীকে। কে সে? সে তো তার জনক। তার পিতা সেই দেবতা। নতুন সম্পর্কের দায়িত্বকে তিনি স্বীকার করতে চান না অথচ খুঁজে বেড়াচ্ছেন সেই আনন্দ। মায়ের তেজে পিতার মুখোমুখি দাঁড়াল তরুণ তেজীয়ান গাইরেমনঞ। জানাল, নিজের সৃষ্টির দায়িত্ব নিতেই হবে সৃষ্টিকর্তাকে। ক্রোধে অধীর পিতা ছেলেকে অভিশাপ দিলেন, 'মানুষের ভালমন্দের দায়িত্বের কথা বলতে এসেছ, মানুষদের হাতেই নিহত হবে তুমি।' কিন্তু এই অভিশাপ উচ্চারণ করে ফেলেই করুণা জন্মাল এ পর্যন্ত বেদনাহীন দেবতার চিত্তে। তখন তিনি অভয় দিলেন সন্তানকে—

এই কঠিন পাথর, বিশাল সব মহীরুহ, কিচিমিচি করা ছোট পাখিগুলি, অরণ্যের বাঘ, এঁকেবেঁকে বয়ে যাওয়া ঝর্ণা—এদেরও আমিই সৃষ্টি করেছি। আমার সন্তান এরা, তোমার আপন ভাইবোন। যে অভিশাপ আমি উচ্চারণ করে ফেলেছি তা আর ফিরিয়ে নিতে পারি না, কিন্তু যখনই আমার অনুচর মানুষেরা চেষ্টা করবে তোমাকে হত্যা করতে, তোমার এই ভাইবোনরা তোমাকে সাবধান করবে। বাঁচবার উপায় বলে দেবে। মনে রেখো, যতদিন এদের কাছাকাছি থাকবে, এদের ভাষা বুঝতে পারবে যতদিন, ততদিন তোমার মৃত্যু নেই।

বাবার সামনে থেকে ফিরে এল গাইরেমনঞ। সারেঙ্গি হাতে তুলে নিয়ে সবদিকে ঘুরে ঘুরে, সকলকে ডাক দিয়ে সে ছড়িয়ে দিতে লাগল নিজের গান। সেই গানে একথাই বলা হল, শত্রুতা করো না, সহায়তাও খুঁজো না। তোমার নিজেরই মধ্যে আছে সব শক্তি, সেই শক্তিকে জাগাও আর তোমার চারিপাশে ঘিরে থাকা ভাইবোনদের দিকে মন রেখো। এরা তোমাকে রক্ষা করবে।

যতবার তাকে আক্রমণ করতে এল কেউ, গর্জন করে উঠল পাহাড়, ঝাঁপ দিয়ে এল বাঘ, কলকল করে সাবধান করল ঝর্ণারা। বহুদিন ধরে সকলকে গান শুনিয়ে শেষে একদিন নিজের গৃহের কাছটিতে আবার ফিরে এল সে। একটি পাহাড়ের মাথায় বসে চোখবন্ধ করে সবচেয়ে যত্ন করে গাইতে লাগল তার সবচেয়ে সুন্দর গানটি। সেই গানে মগ্ন, বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে গেল নদী পাহাড় গাছ বনের পশুপাখি। তার সেই অবসরে চুপিচুপি এসে ধারাল তরোয়ালের কোপ বসিয়ে দিল এক দুষ্টু মানুষ। গড়িয়ে পড়ল গাইরেমনঞের ছিন্নমাথা। সমস্ত পাহাড় বন নদী হায় হায় বিলাপে ভরে গেল।

কিন্তু এখনও তবু জেগে আছে গাইরেমনঞের গান। সেই পাহাড়টির কাছে মানুষ যখন যায়, প্রদীপ জ্বালায়, তাদের কানে বাজে গাইরেমনঞের সেই গান, তোমার আপন ভাইবোনদের চেনো। মনে রাখো তাদের। তারা, একমাত্র তারাই তোমাকে রক্ষা করতে পারে মৃত্যু ও ধ্বংস থেকে।

ছবি তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

আয় মন বেড়াতে যাবি

সুব্রত মুখোপাধ্যায়

উনত্রিশ

পূর্ণবাবুদের দেশ যশোহর জেলার নড়াইল মহকুমার মাইঝপাড়া গ্রাম। তস্য পত্নী আমার পারুলবালা দিদির স্বধাম হল, জিলা ফরিদপুর, মহকুমা, মাদারিপুর, আর গ্রাম, মাওইসার।

পারুলবালার পিতৃমহাশয় তারিণী মুখোপাধ্যায় ছিলেন তদঞ্চলের পয়মন্ত উকিল। তারিণী পত্নী, আমার মা'র দিদিমা, কুসুমকুমারী, দেশগ্রামে সুন্দর বউ নামে রটিত। ভারী আমোদিনী এই কুসুমকুমারী। আমরা ভাইবোনেরা বাবা-মার দেখাদেখি তাঁকে দিদিমা ডাকলে মধুর ঝামটা সহ বলে ওঠেন, আরে থো। বাপেরও দিদিমা, পুতেরও দিদিমা। এই কুসুমকুমারী নাকি একদা সার্থকনামা সুন্দরী ছিলেন। এখনকার ভাঁটা নয়না, ভাঙাগাল আর রোগা ঢ্যাঙা বিবরণের সঙ্গে কোনও মিলই নেই। তবে সৌন্দর্যের নিখাদ আর সতেজ বেঁচে থাকা রয়েছে তাঁর রান্নায়। অমন ডাল, সুক্তো, খিচুড়ি বুঝি আর কারও হাতে মানায় না। কুসুমকুমারী পান মুখে। সর্বদাই মজা-মস্করা আর মহা আনন্দে থাকেন। সকলকে আনন্দে রাখেনও। আমার বড়মামা, যুবক বাবুয়া, ভাল নাম প্রণব, মাথায় রাজ্যের ঔদ্ধত্য সমেত ছিট ধারণ করে, দিদিমাকে সিগারেট ধরিয়ে দেয়। ঘরের বাইরে গুরুগাম্ভীর জামাই আমার কানুটি দাদু পূর্ণচন্দ্র হয়তো ঘুরছেন ফিরছেন। লজ্জায় অপ্রস্তুত শাশুড়ি, নাতির অত্যাচারে দোর বন্ধ করে চোখ মুদে সিগারেটে টান দিচ্ছেন। নাক দিয়ে ফুর ফুর ধোঁয়া নিক্ষেপের সে কী ধুম। কে বলে আনাড়ি। ঘরে উপস্থিত বড়মামার বন্ধুরা, আমরা, বুড়ি মানুষের এই সিগারেট টানার মহিমান্বিত বিরল দৃশ্য দেখছি। এই কুসুমকুমারী শ্রীমা সারদামণির কাছে মন্ত্র নিয়েছিলেন। সে সময় তাঁর সঙ্গে কন্যা পারুলও উপস্থিত ছিল।

গঙ্গা-পদ্মার এপার ওপার তত্ত্বের বাইরে, ঘটি বাঙাল কচালি এড়িয়ে রেখে, মানুষের সংসার বুঝি এমনি করেই বয়ে চলে। তা না হলে, তত্ত্ব অনুযায়ী আমার কানুবাবার ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ফুটবলার হওয়ার কথা নয়। কথা নয়, ঢাকা শহরে খেলতে গিয়ে, বল নিয়ে দ্রুতগতি ছোটার সময় দর্শক চিৎকার শোনার কথা। তারা সরবে বলছে, বাইঠ্যাটারে পারাইয়া দে।

ওই ঢাকারই মাঠে প্র্যাকটিসের ঠিক আগে ক্লাবের এক ইংরেজ কর্তাব্যক্তি প্লেয়ার কানুবাবুকে বললেন, আগের দিন রাতে বৃষ্টি হয়েছে। মাঠের অবস্থা কেমন দেখে এস তো। কানু ইংরেজি বোঝেন, কিন্তু সেই কৈশোরে বলায় কওয়ায় সেরকম সড়গড় নয়। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি তো কম নয়। ফলে, মাঠ দেখে এসে তৎক্ষণাৎ সাহেবকে রাজভাষায় অবগতি, সার, ফিল্ড ইজ গুড। বাট, দেয়ার আর কেঁচমাটিস্। সাহেব-এর পুনঃ পুনঃ অবাক হোয়াট, হোয়াট! কানুবাবুর একই উত্তর, কেঁচমাটিস্। গূঢ়ার্থ হল, মাঠ তো ভালই দেখলাম। কিন্তু কেঁচোর মাটিবহুল।

এখানে বলে নেওয়া জরুরি যে , পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গে আমার পিতামহের তথাকথিত বৈবাহিক সম্পর্ক কদাপি ছিল না। কারণ নৈহাটি মহেন্দ্রস্কুলে শিক্ষকতার সূত্রপাত কালে আমার পিতামহ শিশিরকুমারের সাক্ষাৎ ছাত্র ছিলেন শ্রীমান পূর্ণচন্দ্র। ফলে সম্বোধনের সময়ে তিনি যথারীতি মাস্টারমশাই বলেন। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন। দাদুও তাঁকে—ওহে পূর্ণ—সম্বোধন করেন। সব মিলিয়ে, সংসারের ধরাবাঁধা সম্পর্কাদির বাইরে এমন সব ব্যাপার ভাবলে, কেমনতর ঘুলিয়ে যায়। ছাত্র হচ্ছেন ভাইসম বেয়াই। আবার বেয়াই হয়ে দাঁড়াচ্ছেন প্রণম্য পিতৃতুল্য শিক্ষক। অনেকটা সেই আমাদের পাগলি সরস্বতী দিদির স্বরচিত গানের মতো, আমড়া গাছে ভিজে হলে, বেগুন গাছে পটল হলে, নন্দ এবার মরিবে বলে, আমার কথা যায় রে ভুলে। বোম্ ষট্‌কে ওই নারকোল গাছের মগডালে গিয়ে আট্‌কে...। তবে কথিত আছে, স্কুলে, ক্লাসে পড়াতে পড়াতে, শিশিরকুমার টিচার্সরুমে নস্যির ডিবে ফেলে রেখে আসায়, ছাত্রদের কাছে সবিনয়ে প্রার্থী, ওহে, তোমাদের কারও ডিবেটা একটু দাও না।

প্রবোধচন্দ্রের মুখে সর্বদাই টিমি টিমি হাস্য। তবে যাবতীয় রাগ নিজের ধর্মপত্নীর ওপর। ফলে হাতপাখা নিধন। তোলা উনুন নিক্ষেপণ। এঁর বড় পুত্র সঙ্গত কারণেই আমার মামা হওয়ার আইন। কিন্তু আমাদের পরিবারে যেমন উন্মাদ প্রবল তেমনই সামাজিক সম্পর্কগুলো কেমন গোলমেলে। যাঁর আমার পিসেমশাই হওয়ার কথা তিনি হয়ে যান দাদু। যাঁর আদপে মাতৃস্থানীয় তিনি হয়ে ওঠেন পিসিমা। অথবা পিসিমা বনে যান মামি। মামা যথারীতি পিসেমশাই। কে যে কখন কী ঘটিয়ে বসে আছেন, কোথায় তালা খুলছেন কোনখানে তালা মারছেন, বলা মুশকিল। ছোটদের এ সব ব্যাপারে মাথা দিতে নেই। কিন্তু সেই ছোটরাও তো হঠাৎ প্রশ্ন সঙ্কটে পড়ে। পড়তেই পারে। আবার মাথা টাল কিংবা খুবই সহজ সিধে বাবাকে নিয়ে ছেলে বিচলিত হয়। যেমন বড়দাদু আমার সেই মামা-পিসেমশাই, মানে তস্য পুত্র আমার পিসিমা-মামিমাকে যেদিন বিয়ে করতে যাবেন , সেই দুপুরে ঘরে বসে বেসুরো গুনগুন করছেন। এমতকালে তাঁর বাবা প্রবোধ দরজার পাশ থেকে স-হুঁকি বলে ওঠেন, উউঃ, বিয়ে করতে যাবেন বলে

বাবুর কী আনন্দ।

আমার কানুবাবা অবিশ্যি তাঁর মদ্যাসক্তির ঋণ স্বীকার যান তাঁর জ্যাঠাশ্বশুরের কাছে। কিন্তু ব্যাপারটা পুরোদস্তুর অলীক। নস্য ছাড়া, কালেভদ্রে একটি সিগারেট, আর কোনও বিষয় ছিল না। বাবার সঙ্গে মা'র প্রায় নিত্যকার হাঁকাহাঁকির নাট্যে কানুবাবু স্ত্রীকে বহু প্ররোচনা উপহার দেন, নিজের উত্তেজনা বাড়াবার জন্যে। ফলে এমন কিছু গপ্পো টেনে আনেন। ভাবেন, এটাই বুঝি ব্রহ্মাস্ত্র। কিন্তু আমার মা ওপথে যায় না। ফলে বিস্তর লড়াইয়ের মা, অনশনে আর ক্রন্দনে। বাবাও অনশন সহকারে পরিতৃপ্ত, পরবর্তী লড়াইয়ের লাটাই মনে মনে পাক মারছে। যেটা বেদনার, মা সকলের রান্না-বান্না করছে, বিনি ত্রুটি। সংসারে সবাই খাচ্ছে। শুধু দু'জন বাদ। তবে প্রবোধচন্দ্র তাঁর কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্র বাড়িতে না থাকলে ভাইয়ের বউ আমার দিদিমার কাছে বিনীত হয়ে নিবেদন করেন, দয়া করে আপনার বরের কৌটো থেকে একটা সিগারেট দেবেন কি? ভয় নেই, আমি বিকেলেই ফেরত দিয়ে যাব। বড়ভাই জানেন, ছোটজন দামি আর গোনাগুনতি সিগারেট খায় বলে হিসেব থাকে মনে।

এই বড়দাদু যে এমন কাব্য রচনা করতে পারেন সেতথ্য জানা গেল এই সেদিন। বলাবাহুল্য, সেখানে একটি বুদ্ধির খেলাও আছে।

আমার ভাই মলয় যেহেতু 'ল' বর্ণ বিহীন, নিজের নামটিও মড়য় কয়, 'ল' স্থানে র কিংবা 'ড়' জোগান দিয়ে, তাকে হঠাৎ এক নিরীক্ষায় ফেললেন সুমুখে দাঁড় করিয়ে।

—বল তো—হাল্লাগুল্লা রসগোল্লা নদীনালা ঝালাপালা—

ভাই যথারীতি আউড়ে চলে, হাররাগুররা রসগোররা...

রেডিওয় পান্নালাল ভট্টাচার্য রেকর্ডে কী চমৎকারই গেয়ে চলেছেন এই 'ল' সাধনের নেপথ্যে,

সময় তো থাকবে না মা
কেবলমাত্র কথা রবে
কথা রবে, কথা রবে মা
জগতে কলঙ্ক রবে...

ভারতচন্দ্রের রসাল, মধুর কথালাপে রামপ্রসাদের মন এই শ্রাবণমাসি সকালবেলাটির পড়শি হয়ে দাঁড়ায়। মনে হয়, এই মানুষটির ভিতরে আর পাঁচটি মানুষের চেয়ে এক আনন্দ-বিষাদিনী প্রতিমা বিরাজ করছেন অহর্নিশি। সে কারণে তাঁর সঙ্গ করা মানে যথার্থই কবিতা প্রতিমার সঙ্গ করা, এ মনে হওয়ায় কোনও ভুল নেই, এমনই বিশ্বাস প্রসাদের। মানুষটি সত্যিই ভারী বিচিত্র মনের।

প্রসাদ কন, দাদা, এবার বলো তোমার সংসারের খপর। আমার বৌদিদিটির কী সমাচার। পুত্রাদিরই বা কী খপর?

ভারত হাসেন। সেই হাসির নেপথ্যে খানিক মন মরাও জুড়ে রয়।—কী বলি বল দিকিনি ভায়া। তোমার বউদিদি তো বাস করছেন তাঁর বাপের বাড়ি। আমার ভাইদিগের সঙ্গে সম্পর্ক মন্দ আমার।

প্রসাদ এমন আকাট প্রশ্নে নিজেই অস্বস্তিতে পড়েন। তিনি শুধু বলে ওঠেন, আহা, থাক্ থাক্।

ভারত হাসেন, থাকবে কেন ভাই। সবার কাছে তো পেট খোলসা কর্তে পারিনে। তোমার ঠাঁয়ে বলে খানিক লঘু হই।

—বলো দাদা। আমি তোমার গতিক খানিক সমঝতে পারছি। এই ক-দিনে তোমার ভাইয়ের বউয়ের মুখচন্দ্র না দেখে আমার ভেতরটা উস্তমপুস্তম করছে।

—পরিবারের বিরহ একরকম, আবার সন্তানদের জন্য মন ভার—সেও তো কম নয়।

—তোমার তো এক জোড়া পুত্তুর দাদা।

—না হে। তৃতীয়জনাও আছে। জ্যেষ্ঠ, পরীক্ষিৎ, মধ্যম রামতনু আর কনিষ্ঠটি হল ভগবানচন্দ্র। এখানেই দাঁড়ি পড়েছে।

প্রসাদ মনে মনে চমক টের পান। বুকের তলে তলে মেঘ সঞ্চার হয়। সর্বাণী এখন পূর্নগর্ভের দিকে যাত্রা করে বসে আছে।

প্রসাদ বলে ওঠেন, তাহলে আমার বউদিদি এখন প্রোষিতভর্তৃকা।

ভারত মুখ চওড়া করে হাসেন, বেশ বল্লে ভায়া, বেশ বল্লে। এই বলে দেওয়ার ন্যাজ ধরে যে আমার মনে প্রোষিতভর্তৃকা নিয়ে একখণ্ড কবিতা চাগাড় দিল।

—বলো, বলো দাদা। কেমন চাগাড় হল একটু শুনি না।

—ভারতচন্দ্র এই সকালবেলার তাজা আলোর দিকে তাকান। তারপর আস্তে আস্তে, কেটে কেটে উচ্চারণ করেন,

পরবাসে পতি যার মলিনা বিরহে।
প্রোষিতভর্তৃকা তারে কবিগণ কহে।।
অনল চন্দন চুয়া, গরল তাম্বুল গুয়া
কোকিল বিকল করে অতি।
বিধবার মতো বেশ, অস্থিচর্ম অবশেষ
তাপে কাম পোড়ায় বসতি।।
মনোজ-তনুজ মত, কোদণ্ড করিয়া হত
হাতে লয় পিণ্ডের পদ্ধতি।
সখী-মুখে মান শুনি, পতি এলো হেন গণি
দেখিতে শ্বাসের গতাগতি।।

রামপ্রসাদ দুই হাতে করতালি বাজান যথাসম্ভব শব্দ দমন করে। সে শব্দে রাজার প্রাসাদের হরেক খোপ থেকে গোলা পায়রার দল শূন্যে ঝাঁপ দেয়। তারা এই নিঝুম সকালটির বুকে এমন চকিত উল্লাস শুনে হতচকিত। অবশেষে বিস্তৃত আর বাঁধানো আঙ্গিনার ঊর্ধ্ব শূন্যে তারা পাক দিতে থাকে চক্রাকারে। এইমাত্র রচিত কবিতার পটভূমির আবহে সেই পারাবতের দল হঠাৎই অভিনব এক দিগন্ত মেলে ধরে। এই সময়টির অনুভবের কথা মুখে বলে প্রকাশ করা যায় না। ফলে, যা হয়, সে সবই মনে মনে, সঙ্গোপনে। প্রসাদ শুধু বলেন, সবই ভাল বললে। কিন্তু ওই বিধবার মতো বেশ কথাটি মেনে নিতে পারছিনে যে।

ভারত চোখ তুলে ভাল করে তাকান প্রসাদের চোখে, কেন! বিধবা কি রমণী নয়!

—তা কে বললে। আসলে এই বিধবা বিষয়টি নিয়ে আমাদের সমাজে এখনও যে কী অচ্ছেদ্দা। অবহেলা।

ভারত কিঞ্চিৎ স্বর নিচু করে বলেন, আমি জানি না প্রসাদ, তুমি আমাদের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের একটি সাম্প্রতিক কাণ্ড জান কি না।

—আমি থাকি দূর অজগ্রামে। রাজারাজড়ার সব কাণ্ড আমি জানব কেমনে।

—তাহলে বলি শোন। তবে এ কথা যেন পাঁচকান না হয়।

—বলোই না দাদা।

ভারতচন্দ্র প্রসাদের পাশে বসে পড়েন। তারপর যথাসম্ভব ঘনিষ্ঠ হয়ে অতীব নিচু গলায় বলে ওঠেন, আমাদের এই রাজাটি যেমন বুদ্ধিধর, তেমনি বিচক্ষণ আর ডাকাবুকো। সেই সঙ্গে তেমনই পণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞ আর সুবিজ্ঞ। ফলে এখানকার তাবড় পণ্ডিতদের ওপর, আর হিন্দু সমাজের ওপর তাঁর ভারী দখলদারী।

প্রসাদ ভ্রু কুঁচকে বলেন, জল কোন দিকপানে গড়াচ্ছে ধত্তে পারছিনে।

ভারত বলে যান, সেটাই কথা। যাকে বলে, জল উঁচু তো জল উঁচু। জল নিচু তো জল নিচু।

—তাহলে এত লেখাপড়া করে ফল কী হল দাদা! প্রকৃত পণ্ডিতের তো নিজের বোধ, বুদ্ধি আর বিচার থাকে।

—হুঁ, তবে সব পণ্ডিতই রাজা হন না। আবার সব রাজাও পণ্ডিত হন না।

—তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল দাদা।

—সেটাই বলি তোমায়। আদপে, রাজা যদি শুধুই রাজা হতেন, তাহলে গোল হত না। একই লপ্তে পণ্ডিত আর পণ্ডিত সমাজের কর্তাবেক্তি হয়েই যত খিটকেল হল।

—কীরকম?

—রকম একটাই। সেটা রাজার রকম। পণ্ডিতের নয়।

—একটু ভেঙে বলো দাদা।

—বলি। আসল কথা হল, আমাদের রাজা যদি সত্যি সত্যিই নীতি সচেতন হতেন তাহলে সমাজের অনেক বিগর্হিত প্রথা ঘুচে যেত। তা না করে, তিনি উল্টে, যাতে করে ওই যাবতীয় কুরীতি বলবতী থাকে তার প্রতি যত্ন করে চলেছেন।

—তাহলে ধরে নিতে হবে দেশে প্রতিবাদ করার মতো দ্বিতীয় কোনও বেক্তি নেই।

—পণ্ডিত রাজার মুখের সুমুখে দাঁড়াবে কে ভায়া।

—কেন, তুমি তো আছো দাদা।

ভারতচন্দ্রের মুখমণ্ডলে এবার বাদুলে কালো মেঘের ছায়াপাত ঘটে। তিনি যেন অতি সন্তর্পণে নিজের মুখের আড়ালেই মুখ লুকানোর তোড়জোড় করেন। কী এক অস্বস্তি এসে ঘিরে ধরে রাজকবির অস্তিত্ব। রাজালয়ে, রাজভোগে নিবাস করলে বুঝি কবিকে এমন পাতকী হয়েই থাকতে হয়। রাজা যা যা মধুর কথা শুনতে পছন্দ করেন, তিনি যা শুনলে মনে মনে সহমর্ম টের পান, ভারতকে সেইরকমই অনুশাসন পালন করতে হয়। এমনকী দেশকালের সঙ্কট সময়েও কবির অবস্থান টলে না। হায়, এর চেয়ে আর পাঁচ সাধারণ মানুষ হওয়া ভাল। ভাল, নৈরাজ্যের নিগড় থেকে স্বাধীন দূরত্বে চলে যাওয়া।

কিন্তু রামপ্রসাদ আর ভারতচন্দ্রে তফাৎ যে যোজন যোজন। রাজার কাছটিতে থেকেও তিনি দূর নিবাসী। আর প্রসাদ দূরত্বে বাস করেও কি আশ্চর্য নিকটবিহারী।

ভারত কথা বলেন এ পর্যন্ত খানিক বিরতি নিয়ে।

—এমনকী যদি কোনও ক্ষমতাবান বেক্তি রাজার সুমুখে রুখে দাঁড়ান, তিনি সঙ্গে সঙ্গে তা বিফল করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

প্রসাদ ক্ষীণ হেসে বলেন, হুঁ, রাজা বলে কথা। কার সাধ্যি, সামনে দাঁড়ায়।

ভারত, আমাদের রাজা সত্যি সত্যিই পণ্ডিত কুলমার্তণ্ড। একাদশী তিথিতে দুখিনী আর বালিকা বিধবাদের নির্জলা উপবাসের অনুকল্প বিধান, তাদের বৈধব্য যাতনার অশেষ লাঞ্ছনা, সহমরণ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ এই যাবতীয় অপশাস্ত্রেই রাজা সায় দিয়ে চলেছেন। তাঁর রাজকৃত্যের একটি গুরুতর অংশ হল—অমুক মাসে, অমুক তিথিতে কিংবা বারে তমুক দ্রব্য ভক্ষণ করতে নেই, ইত্যাদি। রাজা যদি এই সব অকিঞ্চিৎকর বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকেন তাহলে সে দেশের ভবিতব্য কি হতে পারে।

প্রসাদ, কিন্তু আমি যতটুকু জানি, মহারাজার আর কোনও কাজ নেই, এমনটি নয়। দেশকালের হাল হকিকত নিয়ে তাঁর সতত চিন্তা।

ভারত, সে তো রাজধর্ম বলেই তো রাজার পোষ্য পণ্ডিতরা কল্পেই হয়। কিন্তু সেখানেও রাজার হস্তক্ষেপ। রাজা অতিরিক্ত পণ্ডিত হলে যা হয় আর কী।

প্রসাদ, কিন্তু রাজার সাম্প্রতিক কাণ্ডটি কী তা যে এখনও জানা হল না দাদা।

ভারত, সেটি হল আর এক রাজার সঙ্গে বিমত বিবাদের কূটকৌশল।

—কে সেই রাজা?

—তিনি হলেন বিক্রমপুরবাসী রাজা রাজবল্লভ। তাঁর অভাগী অল্পবয়স্কা বেচারি কন্যাটি বিধবা। ফলে কন্যার যাতনা থেকে রাজার দিক হতে বিধবা বিবাহ প্রচলিত করার একটি চেষ্টা হল। এই তো, সেদিনের ঘটনা।

—তারপর!

—রাজা রাজবল্লভ তখন বিধবা বিবাহ যে শাস্ত্র বিরুদ্ধ নয়—এই ব্যবস্থা সমুদয় পূব-পশ্চিম দেশের যাবতীয় পণ্ডিতদের কাছ থেকে নিলেন। তারপর নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজের বিধান পাওয়ার বাসনায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে কতিপয় পণ্ডিত পাঠালেন। রাজবল্লভ ঢাকার নবাব, যথেষ্ট ক্ষমতাবান বেক্তি। তিনি মনে করলেন, নবদ্বীপের পণ্ডিতরাও তাঁকে সায় দেবেন।

—বটেই তো।

—হ্যাঁ প্রসাদ, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রাজবল্লভের পাঠানো পণ্ডিতদের মহা আপ্যায়ন করলেন। তাঁদের যাবতীয় কথা শুনে বললেন—আপনাদের প্রভুর অভীষ্ট সাধনে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। বিক্রমপুরের পণ্ডিতগণ সন্তুষ্ট হয়ে ভোজন-বিশ্রামে গেলেন। এরপর রাজা, গোপনে তাঁর সভা পণ্ডিত আর নবদ্বীপের প্রধান প্রধান পণ্ডিতদের তলব করে রাজবল্লভের পাঠানো ব্যবস্থাপত্রটি দেখালেন। সেটি পাঠ করে তাঁরা সানন্দে বললেন—এ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ শাস্ত্রসম্মত।

—তারপর?

—শুনে রাজা খুবই কুপিত হলেন। তাঁর চিত্ত ঈর্ষাদগ্ধ হয়ে পড়ল। তিনি তাঁর পণ্ডিতদের বলে বসলেন—আপনারা শুনে রাখুন, এ ব্যবস্থা শাস্ত্রবিরুদ্ধ না হলেও ব্যবহার বিরুদ্ধ বলে রাজবল্লভকে নিরাশ করতে হবে। একজন বৈদ্য জাতীয় বেক্তি এই চিরকেলে অপ্রচলিত ব্যবহার প্রচলিত করে যাবেন, এ কাণ্ড সহনীয় নয়। কিন্তু এখানে রাজনীতি বলে একটি কথা আছে।

—রাজনীতি! বলো কী দাদা!

—হ্যাঁ, রাজার জন্যেই তো রাজনীতি। সেই অনুযায়ী কৃষ্ণচন্দ্র বল্লেন, এখন রাজা রাজবল্লভের যা প্রভাব-প্রতিপত্তি, তাতে আমি কোনওমতেই তাঁকে বিরক্ত করতে চাই না। অতএব তাঁকে তুষ্ট রাখতে আমি আপনাদের এই ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষরের জন্যে যৎপরোনাস্তি অনুরোধ করব। যদি আপনারা অসম্মত হন তাহলে আপনাদের তাড়নাও করব। কিন্তু আপনারা কইবেন যে মহারাজা বা কারও অনুরোধে আমরা এইরূপ ব্যবস্থা প্রদান করে পাপগ্রস্থ হতে পারব না।

—তারপর কি হল?

ভারত হেসে বলেন, তারপর কি হল শোনার আগে তোমার ঠায়ে মৎ রচিত একখানি নারদের গীত শোনাই ভায়া।

প্রসাদ মিটি মিটি হাসেন, তা বটে। এ সময়ে নারদের গীতই একমাত্র অবলম্বন। তবে কি না গানটি চেপে নয়, গলা খুলে গাইতে হবে।

ভারতচন্দ্র আকাশ মুখে দু'হাত তুলে গেয়ে ওঠেন,

জয় দেবী জগন্ময়ী দীনদয়াময়ী
শৈলসুতে করুণানিকরে।
জয় চণ্ডবিনাশিনী মুণ্ডনিপাতিনী
দুর্গবিঘাতিনি মুখ্যতরে।।
জয় কালী কপালিনি মস্তকমালিনী
খর্পরধারিনি শূলধরে।
জয় চণ্ডী দিগম্বরি ঈশ্বরী শঙ্করী
কৌশিকি ভারত-ভীতি-হরে।।

ছবি শান্তনু দে

(চলবে)

কলকাতায় নবকুমার

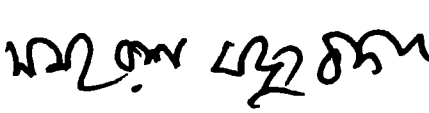

নবকুমারের অভিনয়ে খুশি নন প্রাণকৃষ্ণ। তাকে আরও প্র্যাকটিস করতে হবে। স্টুডিও থেকে বেরবার সময় একটি ছেলে তাকে ডাকে, বলে দিদি ডাকছেন। গ্রিনরুমে গিয়ে বসে নবকুমার। খানিক বাদে উর্মিলা আসে। একথা সেকথার পর উর্মিলা তার সঙ্গে গাড়ি করে বেরিয়ে যায়। কান্ট্রি ক্লাব যাওয়ার প্রস্তাব দিলে নবকুমার বলে, তার টায়ার্ড লাগছে।

উনপঞ্চাশ

বাড়িতে ফেরা মাত্র মুক্তো একটা পোস্টকার্ড এগিয়ে দিল, 'তোমার চিঠি। যাত্রাদলের গদিতে এসেছিল। শেফালি মাকে ফোন করেছিলেন বড়বাবু। আমাকে গিয়ে নিয়ে আসতে হল।'

পোস্টকার্ড হাতে নিয়ে নবকুমার দেখল ওটা বাবা লিখেছে।

'তুমি এখানকার ঠিকানা দাওনি কেন ওদের?'

'তখন রোজ ওখানে যেতাম—!'

'কালই ভবানীপুরের ঠিকানা জানিয়ে চিঠি দেবে। হাঁটতে কষ্ট হয়, ট্যাঙ ট্যাঙ করে আমাকে অত দূরে ছুটতে হল। চা খাবে?'

'না।'

ঘরে এসে আলো জ্বালিয়ে চিঠিটা পড়ল নবকুমার। 'স্নেহের খোকা। আশা করি ঈশ্বরের কৃপায় সুস্থ আছ। কিছুদিন হইল তোমার মা পেটের যন্ত্রণায় গুরুতর অসুস্থ। তাহাকে সদরের হাসপাতালে ভর্তি করিতে হইবে। কিন্তু আমার অর্থাভাব এত প্রবল যে, কী করিব বুঝিতে পারিতেছি না। সত্বর চার-পাঁচ হাজার টাকার প্রয়োজন। ইতি, আশীর্বাদক তোমার বাবা।'

হঠাৎ বুকের ভেতরটায় দারুণ চাপ এবং সেই চাপ থেকে কান্না ছিটকে বের হল। নবকুমার বিছানায় বসে দু'হাতে মুখ ঢেকে কিছুক্ষণ কাঁদল। তার শরীর কিছুতেই স্থির হচ্ছিল না। প্রাণপণে চেষ্টা করছিল যাতে এ ঘরের বাইরে শব্দ না যায়।

মিনিট কয়েক বাদে একটু শান্ত হয়ে আবার চিঠিটাকে দেখল সে। ওপরের ডানদিকে বাড়ির ঠিকানা লেখা। চিঠিটা পোস্ট হয়েছে তিনদিন আগে। তার কাছে যা আছে তা এই মুহূর্তে পাঠাতে ইচ্ছে করছে। যেমন করে হোক মাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে। মায়ের মুখটা মনে পড়ল। এই পৃথিবীর কোনও জটিলতা মাকে স্পর্শ করেনি। জীবন যে কত জটিল, কত হিংস্র তা মায়ের অজানা। মা মানে একজন স্নেহে অভিমানে সারল্যে ভরপুর মানবী ছাড়া আর কিছু নয়। ওঁকে যা বোঝানো হয় তাই ঠিক ভেবে নেন। তাঁর কলিকাতায় আসার ব্যাপারে মায়ের বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না। ছেলেকে কাছছাড়া করতে চাননি তিনি।

মাস্টারদা থাকলে হয়তো একটা ব্যবস্থা হত। মাস্টারদা যদি বড়বাবুকে বলত, নবকুমারকে পাঁচ হাজার টাকা দিন, ওর মায়ের চিকিৎসার জন্যে প্রয়োজন, তাহলে তিনি হয়তো অর্ধেক টাকা দিতেন। বাকিটা সে তার সঞ্চিত টাকা থেকে দিতে পারত। কিন্তু মাস্টারদা না থাকায় তাকেই বলতে হবে কথাটা। কিন্তু বড়বাবু যদি না দেন।

দরজায় শব্দ হল। ঘরে ঢোকার সময় ওটা ভেজিয়ে দিয়েছিল, অভ্যেস। নবকুমার উঠে দরজা খুলে খুব অবাক হল, শেফালি মা দাঁড়িয়ে আছেন।

'আপনি?'

'তোমার শ্যুটিং কবে থেকে শুরু হচ্ছে?'

'বোধহয় পরশু কি তার পরের দিন।'

'এই দফায় তোমার কাজ কতদিনের?'

'আমি জানি না।'

'আঃ!' শেফালি মা বিরক্ত হলেন, 'এসব তো প্রাথমিক ব্যাপার। তোমার যেমন জেনে নেওয়া উচিত, ওদেরও জানানো দরকার। কাকে ফোন করলে জানতে পারবে?'

নবকুমার ভেবে পেল না। গীতিময়বাবু নিশ্চয়ই জানেন। কিন্তু তাঁর ফোন নম্বর জানা নেই। বড়বাবু কি বলতে পারবেন? কবে শুরু হচ্ছে তা নিশ্চয়ই তিনি জানেন কিন্তু তাকে কবে কবে লাগবে এটা নাও জানতে পারেন। মন্দাক্রান্তাকে ফোন করলে কেমন হয়। মন্দাক্রান্তা নিশ্চয়ই গীতিময়বাবুর ফোন নম্বর জানে।

'যে মহিলার ফোন এসেছিল তিনি বলতে পারবেন না?' শেফালি মা জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমি ঠিক জানি না। ওঁকে ফোন করব?'

'নিশ্চয়ই।'

শেফালি মায়ের ঘরে এল ওরা। শেফালি মা নিজেই ডায়াল করে দিলেন। একটু পরেই মন্দাক্রান্তার গলা শুনতে পেল নবকুমার। সে বলল, 'আমি নবকুমার বলছি।'

'হোয়াট এ সারপ্রাইজ। তুমি-এর মধ্যেই ছাড়া পেলে?' মন্দাক্রান্তা শব্দ করে হাসলেন।

'তার মানে?'

'শুনলাম তোমাকে ছবির নায়িকা হাইজ্যাক করে নিয়ে গিয়েছে।'

'কে বলল?'

'এখানে রসালো খবর বাতাসের আগে ছোটে।'

'আমি এখন বাড়িতে। আমার একটা কথা জানা খুব জরুরি। আপনি কি বলতে পারবেন আমার শ্যুটিং ঠিক কবে থেকে শুরু হচ্ছে আর ঠিক কবে কবে আমাকে লাগবে?'

'এটা তো প্রোডাকশন ম্যানেজার বলতে পারবে। কেন বলো তো?'

'আমাকে একবার দেশে যেতে হবে।'

'সেকী? এখন?'

'আমার মা খুব অসুস্থ।'

'ওহো। তুমি পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করো, আমি তোমাকে জানাচ্ছি।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে নবকুমার বলল, 'উনি এখনই জানাবেন বললেন।'

'তোমার মায়ের পেটে কি আগেও যন্ত্রণা হত?' শেফালি মা জিজ্ঞাসা করলেন।

'জানি না। মা কখনও বলেনি।'

'কত বয়স ওঁর?'

'আমার চেয়ে সতেরো বছরের বড়। এখনও চল্লিশ হয়নি।'

'তোমাদের গ্রামে হেলথ সেন্টার নেই?'

'না। পাশের গ্রামে আছে। কিন্তু সেখানে ওষুধপত্র পাওয়া যায় না।'

'সদর হাসপাতাল কতদূরে?'

'বাসে দেড়ঘণ্টা লাগে। তবে বাড়াবাড়ি হলে লোকে রোগীকে কলিকাতায় নিয়ে আসে। কিন্তু সবাই তো সেটা পারে না।'

'কেন?'

'টাকাপয়সার জোগাড় করতে পারে না।'

এইসময় ফোন বাজল। শেফালি মা বললেন, 'ধরো। তোমার ফোন।'

রিসিভার তুলল নবকুমার। মন্দাক্রান্তার গলা, 'তুমি কাল গিয়ে পরশু ফিরে আসতে পার। তরশু বিকেলে তোমার শ্যুটিং হওয়ার কথা। যদি দ্যাখো খুব সমস্যা তাহলে তরশু এসো। তবে তার আগে আমাকে একটা ফোন করবে। আমি গীতিময়বাবুকে বলব তারপরের দিন থেকে তোমার কাজ আরম্ভ করতে। এতে হবে?'

'অবশ্যই। আপনি আমার খুব উপকার করলেন।'

'তুমি সত্যিই একটা বুদ্ধু। বন্ধুর বিপদে পাশে দাঁড়ানো মানে তার উপকার করা নয়। রাখছি। গুড নাইট।'

শেফালি মাকে জানাল নবকুমার।

শেফালি মা বললেন, 'তাহলে তুমি ভোর ভোর বেরিয়ে ট্রেন ধরো।'

মাথা নাড়ল নবকুমার, 'সকালে যাওয়া যাবে না।'

'কেন?'

'বড়বাবু বারোটার আগে গদিতে আসেন না। অন্তত চার হাজার টাকা না নিয়ে গেলে কোনও কাজ হবে না। আমার কাছে যা আছে তাতে হবে না। বাকি টাকাটা ওঁর কাছে ধার চাইতে হবে।' কথাগুলো বলে দরজার দিকে হাঁটছিল নবকুমার। শেফালি মা বললেন, 'দাঁড়াও।' তারপর টেবিলের ওপর রাখা একটা বই-এর ভেতর থেকে চিলতে কাগজ বের করলেন, 'তুমি কাল ভোরেই যাবে। মনে হয় তুমি পৌঁছবার আগেই ওঁরা টাকা পেয়ে যাবেন।'

শেফালি মা কাগজটা এগিয়ে দিতে সেটা নিয়ে নবকুমার দেখল ওটা একটা রসিদ। পাঁচ হাজার টাকা টিএমও করা হয়েছে নবকুমারের বাবার নামে আজ দুপুর তিনটের সময়। সে হতভম্ব হয়ে গেল।

শেফালি মা বললেন, 'যাও। খেয়ে শুয়ে পড়। মুক্তো তোমাকে ভোরবেলায় ডেকে দেবে।'

কথাগুলো কানে ঢুকল না। নবকুমার দুহাতে মুখ ঢেকে হাউ হাউ শব্দে কেঁদে উঠল। শেফালি মা এগিয়ে এলেন, 'কাঁদছ কেন? তোমার মা ভাল হয়ে যাবেন।'

'আপনি-আপনি—আমি আপনার কেউ নই। আমাকে

ভাল করে জানেনও না। কিন্তু চিঠিটা দেখে আপনি এতখানি উপকার করবেন আমি চিন্তাও করিনি।' প্রতিটি শব্দ কান্নায় জড়ানো ছিল।

শেফালি মা হাসলেন, 'তুমি কি ভেবেছ আমি টাকাটা দান করেছি?'

মুখ থেকে হাত সরাল নবকুমার, 'না-না!'

'ঠিক। আমি তোমাকে ধার দিয়েছি। ওঁদের এখন টাকার দরকার। তাই। কিন্তু এই ছবি থেকে যে টাকা তুমি পাবে তার পাঁচ হাজার আমাকে ফেরত দেবে। ব্যস। যাও।' শেফালি মা নবকুমারের কাঁধে হাত রাখলেন।

ভোর ভোর ডেকে দিয়েছিল মুক্তো। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিজের জমানো টাকা প্যান্টের ভেতরের পকেটে ঢুকিয়ে বাইরে আসতেই মুক্তো বলল, 'সাবধানে যেও। পারলে মাকে ফোন করো।'

'শেফালি মা?'

'ঘুমাচ্ছেন। তুমি যাও, আমি বলে দেব।'

জামাপ্যান্ট ইত্যাদি নেওয়ার জন্যে মুক্তো যে ব্যাগটা দিয়েছিল সেইটে হাতে নিয়ে ভোরের রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। এখনও সোনাগাছির ঘুম ভাঙেনি। পৃথিবীর যে কোনও শান্ত নির্জন জনপদের সঙ্গে এখানকার কোনও পার্থক্য নেই।

ট্রেনে বসার জায়গা পেয়ে গেল। এত সকালের ট্রেনে ভিড় নেই। ট্রেন ছাড়তেই মাস্টারদার মুখ মনে পড়ল। সেই সঙ্গে শীতশীত বোধ এল। মাস্টারদা নেই। মাস্টারদার উৎসাহে তার সঙ্গে কলিকাতায় এসেছিল সে। অভিভাবকের মতো তাকে সামলে নিয়ে এসেছিল মাস্টারদা। অথচ কলিকাতা থেকে দেশে যাওয়ার সময় এই ট্রেনে মাস্টারদা নেই। শুধু ট্রেনে কেন, পৃথিবীর কোথাও নেই। চোখ বন্ধ করল। বুকের ভার ক্রমশ বাড়ছে। আচ্ছা, একটা মানুষ পৃথিবীতে একটু একটু করে বড় হয়ে কত কী করার স্বপ্ন দ্যাখে, আশা হতাশায় দোলে কিন্তু বেশ টগবগে হয়ে থাকে, কিন্তু মরে যাওয়ার পরে তার সব কিছু কেন শেষ হয়ে যাবে? শুধু যারা বেঁচে থাকার সময় কিছু রেখে দিয়ে যান, যেমন বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, মারা যাওয়ার পরেও তাঁরা অন্যরকমভাবে বেঁচে থাকেন বহুবছর। কিন্তু সাধারণ মানুষের উল্লাস অথবা কান্নাগুলো যারা থেকে গিয়েছে তাদের স্মৃতিতে থাকবে না? তাদের দেহ ছাই হয়ে গেলেও বাতাসে তাদের অস্তিত্ব কি মিশে থাকবে না।

'এই যে ভাই, কাঁদছ কেন? কিছু হয়েছে?'

প্রশ্ন শুনে চোখ খুলল নবকুমার। একজন বৃদ্ধ তার সামনের সিটে বসে তাকিয়ে আছেন।

সে চোখ মুছল। কথা না বলে মাথা নেড়ে বোঝাল কিছু হয়নি।

এই ট্রেনেই ছুটকিদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। ওরা কেমন আছে কে জানে। ছুটকির দিদির সেইসব কথাবার্তা শোনার পর তার আর যেতে ইচ্ছে করেনি ওদের বাড়িতে। এতদিন ওদের কথা একবারও মনে পড়েনি। ছুটকিরাও নিশ্চয়ই মনে রাখেনি। এইভাবে কত লোকের সঙ্গে পরিচয় হয় আবার তারা জীবন থেকে মুছে যায়। নবকুমার জানলার বাইরে তাকাল। ট্রেনের গতি এখন খুব কম। ওপাশে বাড়ি দোকান দেখা যাচ্ছে। একটা সিনেমার পোস্টার চোখে পড়ল। মিঠুন চক্রবর্তী দুর্গার মতো অনেকগুলো হাত নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। হলে সিনেমা আসার সময় এইরকম পোস্টার তাদের গ্রামেও পড়ে। সে যদি শেষ পর্যন্ত ঠিকঠাক অভিনয় করতে পারে এবং সিনেমাটা যদি হলে দেখানো শুরু হয় তাহলে নিশ্চয়ই এইরকম পোস্টার চারধারে সাঁটা হবে। সেই পোস্টারে কি তার মুখের ছবি থাকবে? যদি থাকে তাহলে ছুটকিরা নিশ্চয়ই সেই ছবি দেখে তাকে চিনতে পারবে। খুব অবাক হয়ে যাবে ওরা। হঠাৎ খেয়াল হল নবকুমারের। গীতিময়বাবু তাকে ছবির নামটা বলেননি। এমনকী মন্দাক্রান্তাও নয়। ওরা না বলুক, সে নিজে জিজ্ঞাসা করেনি কেন? নিজেকে একটা গবেট ছাড়া আর কিছু মনে হচ্ছিল না নবকুমারের।

আজ ট্রেন ঠিক সময়ে চলছিল। দুপুরের কাছাকাছি চেনা নামের স্টেশনগুলো দেখে সে বেশ আরাম পেল। তারপর ওদের নামের স্টেশনে ট্রেন থামতেই লাফিয়ে নিচে নামল। দ্রুত প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরুতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল। চেকারবাবু ধারে কাছে নেই। সে আশেপাশে তাকিয়ে দূরে লোকটাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেল, 'এই নিন টিকিট।'

লোকটার মুখ হাঁ হয়ে গেল। একে আগে দ্যাখেনি সে।

স্টেশনের বাইরে পা দিতেই রিকশাওয়ালাগুলো তার দিকে তাকাল। একজন বলল, 'কলিকাতায় থাকা হয় এখন?'

মাথা নাড়ল নবকুমার। প্রশ্ন করেই রিকশাওয়ালা উৎসাহিত হল অন্য যাত্রী দেখে। ওরা জানে রিকশায় ওঠার ছেলে সে নয়।

রতন পেছন ফিরে চা বানাচ্ছিল। নবকুমার গম্ভীর গলায় বলল, 'এক কাপ চা।'

'দিচ্ছি।' রতন না তাকিয়ে বলল।

দুটো গ্লাস চা বানিয়ে একজনকে দিয়ে দ্বিতীয়টা নবকুমারের দিকে এগিয়ে ধরেই সে চিৎকার করল, 'আরে! তুই?'

'গলা শুনে চিনতে পারিসনি।' চা নিল নবকুমার।

হঠাৎ মুখের চেহারা বদলে গেল রতনের, 'কী হয়েছিল রে? আমি তো বিশ্বাস করতে পারিনি খবরটা পেয়ে।'

'বিশ্বাস করা যায় না। দু'দল বোম নিয়ে লড়াই করছিল, হঠাৎ তার মধ্যে গিয়ে—।'

'শুনেছি। সেটা নাকি বেবুশ্যেদের পাড়ায়। মাস্টারদা যে ওই পাড়ায় যেত তা আমি কখনও ভাবতে পারিনি। সবাই বলছে ওরকম লোকের ওইভাবেই মরণ হয়। কিন্তু আমার এই কথা মানতে ইচ্ছে করছে না।' রতন বলল।

'মাস্টারদা আমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল।' নবকুমার বলল।

'ভ্যাট। তুই কি নষ্ট মেয়েদের পাড়ায় থাকিস?'

'কলিকাতায় নষ্ট আর ভাল পাশাপাশি থাকে। আমার সঙ্গে দেখা করে শর্টকাট করতে গিয়ে মারা গিয়েছে মাস্টারদা। যারা বদনাম ছড়াচ্ছে তাদের বলে দিস।' গ্লাস রেখে চায়ের দাম দিতে যাচ্ছিল নবকুমার। রতন বলল, 'ওটা থাক। বিকেলে আয়, কথা হবে।'

'বলতে পারছি না। মাকে নিয়ে হাসপাতালে যেতে হতে পারে।'

'কেন? মাসিমার কী হয়েছে?'

'জানি না। গিয়ে শুনব।' হাঁটা শুরু করল নবকুমার।

পরের এপিসোড আগামী রোববার

ছবি তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

NIIT
Be more ambitious

TIMES ASCENT

presents

NIIT

4th National IT Aptitude Test

Test date : 20th Jan, 2008.
Last date for application : 18th Jan, 2008.

Supported by Adobe Solution PARTNER
EMC² where information lives®
Microsoft®
Java Sun AUTHORIZED SUN EDUCATION CENTER
ORACLE® WORKFORCE DEVELOPMENT PROGRAM

KOLKATA CITY: **Camac Street**: 30580544; **Shyambazar**: 25547136; **Gariahat** : 24657025; **Kakurgachi**: 30180260; **VIP Road**: 32944343; **Behala**: 24478746 **College Street** : 64551234; **Dunlop**: 25789871; **Hazra**: 24851770 **Jadavpur**: 24130194; **Majerhat** : 32421692; **Salt Lake**: 64509596; **Tollygunge**: 24818390; **Bengal:** **Barrackpur** 32951653; **Barasat** 25423277; **Howrah** 64527073; **Shibpur** 26415367; **Madhyamgram** 26268793; **Asansol** 2252100; **Durgapur** 2545730; **Burdawan** 2566729; **Haldia** 275582; **Kalyani** 25022008; **Midnapur** 642892; **Siliguri** 3202657, **Coochbehar** 9232878004; **Darjeeling** 2254467; **Jalpaiguri** 220508; **Kalimpong** 259182; **Malda** 284102;

হাত বাড়ালেই রাইমা। খুচখাচ ঝামেলা, টুকটাক সমাধান। একটু বন্ধুত্ব আর অনেকটা বিশ্বাস। চিন্তা কিসের, আপনার কাছে রাইমা আছে

এক বছর আগে চিকেন পক্স হয়েছিল। এখনও মুখে, বিশেষত দু'গালে কালো দাগ রয়ে গিয়েছে। কীভাবে এই দাগ রিমুভ করব?

—সন্তু পরামানিক, সন্দেশখালি

এমনিতে চিকেন পক্সের দাগ মেলানোর জন্য ডাবের জল খুব উপকারী। তবে পটল পুড়িয়ে সেই রস মাখলে খুব তাড়াতাড়ি উপকার পাওয়া যাবে।

আমার গায়ের রং চাপা। কোন শেডের লিপস্টিক ইউজ করলে আমাকে মানাবে?

—তনুশ্রী দত্ত, লিলুয়া

চাপা গায়ের রঙে প্লাম, ওয়াইন বা রেড শেডের লিপস্টিক ইউজ করলে তোমাকে ভাল লাগবে।

আমার সবচেয়ে বড় সমস্যা, বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে। ছেলেটি আমাকে ভালবাসলেও অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে ভীষণ রকমের ফ্লার্ট করে। আমি কিছু বললে, ও আমার কথা হেসে উড়িয়ে দেয়। বলে, এগুলো নিছকই ইয়ার্কি! কিন্তু গোটা ব্যাপারটা আমার কাছে খুব বিরক্তিকর।

—পারমিতা ঘোষ, নাকতলা

আমার মনে হয়, আপনার বয়ফ্রেন্ড হয়তো মেয়েদের সঙ্গে গল্পগুজব, রসিকতা, ঠাট্টাইয়ার্কি করতে ভালবাসেন। সেটাকেই হয়তো আপনার ফ্লার্ট বলে মনে হচ্ছে। উনি আপনার সঙ্গে প্রেম করছেন বলে ওঁর যে কোনও মেয়েবন্ধু থাকবে না, এমনটা তো নয়! তবে সবকিছুই ব্যালেন্স করে চলতে হয়। আপনি বয়ফ্রেন্ডকে এগুলো বোঝান। ওঁর সো কল্ড ফ্লার্ট-এর ঠেলায় যে আপনি হার্ট (Hurt) হয়েছেন, সেটা বলুন ছেলেটিকে।

আমার সমস্যা হল, হঠাৎ করে লাইফটা ভীষণ একঘেয়ে লাগতে শুরু করেছে। কোনও কাজে মন দিতে পারছি না। মাথাটা যেন সবসময় ভারি হয়ে আছে। প্লিজ হেল্প।

—সায়ন সেন, বজবজ

আপনি একটা কাজ করুন। যে কাজটা করতে ভাল লাগছে না, সেটা কয়েকদিন বন্ধ রেখে অলটারনেটিভ কোনও কাজ করুন। যে কাজটাই করবেন, সেটাকে ভালবেসে করুন। গল্পের বই পড়ুন, গান শুনুন, টিভি দেখুন, টুকটাক মজার এসএমএস পাঠান একে-তাকে! যদি এগুলোতেও কিছু না হয়, তাহলে সব কাজের চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে ছুটি নিয়ে বাইরে ঘুরে আসুন।

আমার বয়স বারো। আমি ক্লাসে সবসময় ভাল রেজাল্ট করি। তবে ফার্স্ট-সেকেন্ড হতে পারি না। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করি, র‍্যাঙ্ক করতে—কিন্তু পারি না। এতে আমার মা, বাবা আমার ওপর ভীষণ রাগ করেন। আমি কিছুতেই বাবা-মাকে সন্তুষ্ট করতে পারি না। এটাই আমার সবচেয়ে বড় সমস্যা!

—অবন্তিকা সাহা, দমদম

তোমার চিঠির উত্তরটা আমি তোমার বাবা-মা'র উদ্দেশে দিচ্ছি। আপনারা কখনওই ছেলেমেয়েদের ক্ষমতার বাইরে তাদের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করবেন না। ওদের যা বয়স, সেই অনুযায়ী ওরা সাধ্যমতো চেষ্টা করছে। ভুল করলে, পড়াশোনায় ফাঁকি দিলে নিশ্চয়ই বকুন। কিন্তু রাগারাগি করে, অসন্তুষ্ট হয়ে ছোট্ট কাঁধে ভারি বোঝা চাপাবেন না। প্লিজ।

আমার মেয়ের বয়স এগারো। আমি চাই মেয়েকে গানের ক্লাসে ভর্তি করাতে। কিন্তু মেয়ের নাচ শেখার দিকেই ঝোঁক বেশি। ভেবেছিলাম, জীবনে আমি যা শিখতে পারিনি, মেয়েকে শিখিয়ে সেই শখ পূরণ করব। কিন্তু মেয়ের ইচ্ছা যে দেখছি পুরো উল্টো!

—কাকলি শর্মা, বালিগঞ্জ

আপনাদের মতো অধিকাংশ বাবা-মায়েরাই এই ভুলটা করেন। নিজেদের ইচ্ছাগুলো জোর করে সন্তানদের ওপর চাপিয়ে দেন। ভুলে যান, ওদেরও একটা নিজস্ব ভাবনার জগৎ আছে। ইচ্ছে-অনিচ্ছে আছে। আমার মতে, যার যেটাতে ইন্টারেস্ট, সেটাই শেখানো উচিত। ওই যে বললাম, যে কোনও কাজ ভালবেসে করা উচিত। জোর করে, তেতো গেলানোর মতো করে কোনও কিছু শেখানো যায় না। এবার ভেবে দেখুন, কী করবেন!

এই ঠিকানায় লিখো—সেন সলিউশনস, রোববার, সংবাদ প্রতিদিন ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৭২

রক্তবরণ মুগ্ধকরণ

ড্যাশ অফ দিস, ড্যাশ অফ দ্যাট। কিছু এই, কিছু ওই,—যা পাই তাই খাই। ড্যাশ মানে শূন্যস্থানটুকু পূরণ করবেন আপনি। ছাঁকা নম্বর, গ্যারান্টি।
বর্ণিনী মৈত্র চক্রবর্তী

ভিয়েতনামের চিত্র পরিচালক পল কয়ান তাঁর ছবি 'The Anatomy of a spring roll'-এ বলেছিলেন খাবারই নাকি মানুষের প্রথম ভাষা। প্রথম কি না তা সঠিক করে বলতে না পারলেও একটা জিনিস কিন্তু ঠিক যে খাবার মানুষের মধ্যে যোগাযোগের একটি সূত্র। এই ধরুন, যেমন চিন, চাইনিজ খাবারের বিচরণ ক্ষেত্র পাঁচতারা রেস্তোরাঁ থেকে ফুটপাথ কিন্তু চিনা ভাষা—কয়েকটা নম হোয়ং হো, জ্যাকি চ্যান বাদে সবই তো হিব্রু বিদেশিই বা কেন, আমাদের দেশেই ধরুন দক্ষিণ ভারত ইডলি, দোসা চেটেপুটে খেলেও ভাষাটা কিন্তু এখনও আয়ত্ত করে ওঠা হয়নি অনেকেরই। ভাষা যেমন জাতির পরিচয়, খাবারও কিন্তু তাই। আসলে খাবারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নানা প্রতীক, সংস্কার—একটা পুরো সংস্কৃতির ছবি যেন ফুটে ওঠে মনে। তাই রসনা তৃপ্তির পাশাপাশি একটা বড় সামাজিক ভূমিকা আছে ওই নিত্যদিনের পাতেই।

আসুন, আজ সাউথ ইস্ট এশিয়াকে চিনি তাদের কুইজিন দিয়ে। এই অঞ্চলকে বলে কুকম্ব অ্যান্ড ইটারস

প্যারাডাইস চলুন এই স্বর্গোদ্যানে একটু ঢুঁ মারা যাক। না না, আপনাকে বেশি দূর যেতে হবে না, সোজা চলে যান সিটি সেন্টারের রেস্তোরাঁয়, নাম—ড্যাশ অফ দিস, ড্যাশ অফ দ্যাট ছোট্ট কোজি এই রেস্তোরাঁতে সাউথ ইস্ট এশিয়ান বা প্যান এশিয়ান কুইজিনের থ্রিল পাবেন। থাই, ইন্দোনেশিয়ান, মালেশিয়ান আর চাইনিজ খাবারের পসরা সাজানো রেস্তোরাঁতে।

অরুন্ধতী গুহঠাকুরতা প্রায় বছর চল্লিশ ধরে সিঙ্গাপুরে বসবাস করছেন। সেখানে অনেক ছোট ছোট স্পেশ্যালিটি রেস্তোরাঁ আছে। এরকমই একটি পরিকল্পনা

নিয়ে তিনি চলে আসেন কলকাতায়, আর কলকাতা উপহার পায় পকেট ফ্রেন্ডলি প্যান এশিয়ান কুইজিন। পুরো রেস্তোরাঁটি সাজানো মালেশিয়ান পুতুল, চাইনিজ পাজল—দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলের হস্তশিল্প দিয়ে। আর মেনু কার্ড-এ থাই খাবারের নামই বেশি চোখে পড়ে।

সেই ভাত বা নুডলস তার সঙ্গে যোগ হয়—'a pinch of this, a sprinkle of this, a little of so and so, a dash of that...' সত্যি স্বর্গোদ্যান। আর এই এক চিমটেতে থাকতে পারে লেমন গ্রাস, গালাংগা (চাইনিজ আদা), লাল লঙ্কা বা খানিকটা নারকোলের দুধ।

থাই কুইজিন-এ পাঁচ ধরনের ফ্লেভারই মজুত। বিভিন্ন ধরনের লতাপাতা, ঔষধি, টাটকা মশলা ব্যবহার হয় রান্নায়। তবে বাঙালি রান্নার মতো পঞ্চব্যাঞ্জন এরা রাঁধে না। ভাতই এই কুইজিনের প্রধান খাবার, 'জ্যাসমিন রাইস' খুবই প্রসিদ্ধ। গরম গরম ভাতের সঙ্গে অতি সুগন্ধী সব কারি, লেমন গ্রাস, লেমন জুস, লঙ্কা খাওয়া এখানকার রেওয়াজ। আর ভাতের সঙ্গে এই সমস্ত উপকরণ মিশিয়ে যে পদটি এরা তৈরি করে তার নাম 'খাও রাদ গাং'। লঙ্কা, রসুন আর চিংড়ি মাছ বাটা দিয়ে তৈরি হয় একটি পদ—'নামপ্রিক' যা এদের ডেলিকেসি, অনেকটা শুটকি মাছের মতো। এই নামপ্রিকের মধ্যে সবজি মিশিয়ে যেমন খাওয়া যেতে পারে তেমন শুধু গরম ভাতে দিয়েও খেতে পারেন। পেস্ট ব্যাপারটাই থাই কুইজিনের ফর্তে। গ্রিন কারি পেস্ট, রেড কারি পেস্ট, ইয়েলো কারি পেস্ট—পেস্ট বানাও—মাংস বা আনাজ মেশাও আর গরম গরম ভাত দিয়ে হাপুস-হুপুস করে খাও।

ড্যাশ অফ দিস, ড্যাশ অফ দ্যাটের মেনু কার্ড-এ পাবেন ভেজিটেবিল থাই স্প্রিং রোল, গ্রিন পাপায়া স্যালাড, টম কা কাই (এক ধরনের স্যুপ যা কিছু হার্বস আর নারকোলের দুধ দিয়ে তৈরি), চিকেন গ্রিন কারি ও আরও অনেক পদ। তবে খাওয়ার শেষে মালেশিয়ান ডেসার্ট 'গুলা মালেকা' খেতে ভুলবেন না। সাবু, নারকোলের দুধ আর গুড়ের অসাধারণ একটি খাবার এটি। তবে এটি সবসময় পাওয়া যায় না, তাই আগে থেকে অর্ডার দিন।

আপনার বাড়িতেই হাজির হোক এক টুকরো ব্যাঙ্কক। কিছু এই কিছু ওই—নতুন পদ বানাবই।

এক প্লেট রেড কারি পেস্ট বানাতে লাগবে

লাল লঙ্কা—১০ টা
রসুন—৪ কোয়া
গালাংগা—১ টেবিল চামচ
পেঁয়াজ—১ টা
গোল মরিচ গুঁড়ো—১ চা চামচ
লেমন গ্রাস—২ স্টক
লেবুর রস—২ চা চামচ
ধনের গুঁড়ো—১ চা চামচ
ধনেপাতা কুচি—২ টেবিল চামচ
শুকনো চিংড়িমাছ বাটা—২ টেবিল চামচ
সাদা তেল—১ টেবিল চামচ
নুন—স্বাদ মতো

এবার

প্রথমে লাল লঙ্কা ঈষদোষ্ণ জলে ভিজিয়ে রাখুন। এরপর লঙ্কা, পেঁয়াজ, রসুন, ধনেপাতা, লেমন গ্রাস, গালাংগা সব মিক্সারে দিয়ে মিক্স করে নিন।

এবার গোলমরিচ গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, পোস্ত গুঁড়ো,লেবুর রস, শুকনো চিংড়িমাছ বাটা আর নুন মিশিয়ে দিন। সমস্ত মিশ্রণটি ভাল ফেটিয়ে নিন। রেড কারি পেস্ট তৈরি। এতে ছোট ছোট চিকেনের টুকরো দিতে পারেন, নয়তো বা শুধু গরম গরম সাদা ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

ছবি তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

Approach Roads & Bridges

Multi-product SEZ's

Several Small & Medium Scale Enterprises

Health, Education & Residential Developments

Over 17 lakh job opportunities

Coming Soon

NKID

NEW KOLKATA INTERNATIONAL DEVELOPMENT

A City of New Opportunities

A City of New Opportunities

For the growth and transformation of the economic and social landscape of West Bengal.

unitech | USE Universal Success

Chowringhee Court, 4th Floor, 55 & 55/1, Chowringhee Road, Kolkata - 700 071
033-40026160

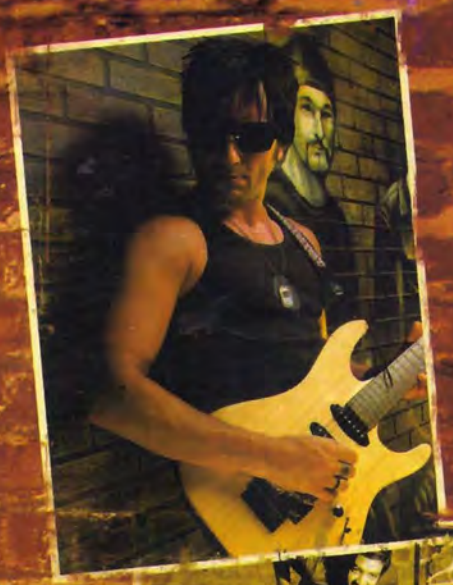

SAIF. PARIKRAMA. STRINGS. AND OF COURSE, MAYHEM.

25TH JAN AT NICCO PARK, KOLKATA.

Seagram's

ROYAL STAG

Mega music

PRESENTS ROCK STAR

SAIF ALI KHAN
LIVE WITH PARIKRAMA
ALSO FEAT. STRINGS

BROUGHT TO YOU BY

TVS FLAME

IN ASSOCIATION WITH

Colgate MaxFresh COOLING CRYSTALS

BEAGHAM'S FUEL CDs

Cassettes and CDs

EVENT PROMOTED BY globosport

indiatimes Mail — live out of the inbox — www.indiatimes.com

TO WIN FREE TICKETS, LOG ON TO www.royalstag.indiatimes.com

JD SOUND AND LIGHT PARTNER

TRANSPORT PARTNER Hertz Self Drive

bookmyshow TICKETING PARTNER

TICKET PRICE: RS 450/600
TO BOOK TICKETS ONLINE LOG ON TO
www.bookmyshow.com OR CALL 39895050